হায় মানবতা! হায় বিশ্ব বিবেক!!

মোল্লা মারজান

হায় মানবতা! হায় বিশ্ব বিবেক!!

মূল

মোল্লা মারজান

শীর্ষ তালিবান কমান্ডার

অনুবাদ
ও
সম্পাদনা

❖ লিসানুল হক লাস্‌সান ❖ আলাউদ্দীন বিন সিদ্দীক
❖ সদীকুল্লাহ মিসবাহ ❖ বুরহান উদ্দীন সাঈদ

জাগরণ প্রকাশন

পৃথিবীর দিকে দিকে
ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদরত
সকল জানবায মুজাহিদ
এবং
তামাম শহীদানের উদ্দেশে...

—অভিন্ন কাফেলার সহযাত্রী

হায় মানবতা! হায় বিশ্ব বিবেক!!

মোল্লা মারজান

অনুবাদ ও সম্পাদনা
লিসানুল হক লাস্‌সান
সদীকুল্লাহ্ মিসবাহ
আলাউদ্দীন বিন সিদ্দীক
বুরহান উদ্দীন সাঈদ

প্রকাশনায়
জাগরণ প্রকাশন

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০০২

কম্পোজ
আল-আরব কম্পিউটার
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রচ্ছদ
যাকারিয়া

শুভেচ্ছা বিনিময় : পনর টাকা মাত্র।

আমাদের কথা

সকল প্রশংসা মহান স্রষ্টার জন্য, যিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সুরক্ষায় 'কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ্'কে ফরয করেছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম সেই মহামানব 'নাবিয়্যুস সাইফ' মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি, যিনি আপন মুবারাক যিন্দেগীতে 'কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ'র অনুশীলন করে আমাদের পথ-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

হক-বাতিলের লড়াই স্রেফ হাল-যামানায় নয়, বরং দুনিয়ার শুরুলগ্ন থেকে আজতক্ অবিরামভাবেই চলে আসছে। আল্লাহ্ তাআলা এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন হক ও সত্যের ধারক ও বাহকদের জন্য; কোন বাতিলের জন্য নয়। বাতিল যদি চায় হক তথা ইসলামের অগ্রগতি রোধ করতে কিংবা ইসলামের আলোকে ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে, তাহলে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্ম নেয়া স্বাভাবিক।

ওয়াকিফহালদের কেউ একথা অস্বীকার করবে না যে, যুগ যুগ ধরে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপর চলছে অসহ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন। এ দলন থেকে মুসলমানদের হিফাযাত করার লক্ষ্যে কাওমের কিছু

জানবায নওজোয়ান বিভিন্ন সময়ে কোন কোন স্থানে আপন শৌর্য-বীর্যের নব-চেতনায় জাগরিত হয়, যা হল কাওমের মুহাফিয হিসাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব। এদেরকে বলা হয় মুক্তিকামী বা মুজাহিদ। বিরোধিতার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং এসব জানবায মুজাহিদীনের পক্ষে শান্তিকামী ও আযাদীপ্রিয় যে কোন মানুষের স্বার্থহীন সমর্থন এবং সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতা করা নৈতিক দায়িত্ব। দুনিয়ার সবাই তা বুঝলেও বুঝতে চায় না অমানুষ বুশ-ব্লেয়ার এবং দোস্তাম-কারজাইদের মত তাদের ক্রীড়নকরা। চরম অত্যাচারী তারা। পাথরের চেয়েও কঠিন তাদের দিল-এই দাবীর পক্ষে এখন আর দলীল পেশ করতে হয় না। যেমন দলীল পেশ করতে হয় না 'সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে' এ কথার পক্ষে। কাউকে প্রমাণবিহীন দোষী বলে আঘাত করতেও তাদের বাধ সাধে না। অন্যায়-স্বার্থের লোভে কোন দেশের উপর আক্রমণ করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না।

আন্তর্জাতিক আইন মুতাবিক যুদ্ধবন্দীদের সাথে কেমন আচরণ করতে হয়, তা জাতিসংঘের অন্ত র্ভূক্ত কোন দেশ জানে না, এমন দাবী কেউ করতে পারবে না।

আমেরিকা-বৃটেনের মত জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য দেশ এবং তাদের দোসরদের হাতে আফগান-ভূমিতে তালিবান যুদ্ধবন্দীদেরকে যে পাশবিকতা ও নৃশংসতায় হত্যা করা হল, তা দুনিয়া আর দেখেছে কি-না আমাদের অজানা। কীভাবে জিন্দা তালিবান বন্দীদের গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করা হয়! কীভাবে বন্দী তালিবানের ঘাড় মটকিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং তারপর তড়পাতে শুরু করলে তাদের

নিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়া হয়! এবং কীভাবে পিছমোড়া করে বাঁধা অসহায় তালিবানের উপর গুলী করার মত নির্মমতা প্রদর্শন করা হয়! পাঠক যদি এ বইয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন, তাহলে এসব কলজেছেঁড়া কাহিনীর বিস্তারিত জানতে পারবেন। হৃদয়ে রক্ত-ক্ষরণ হয়। কলজে ফেটে খান খান হয়। ডুকরে ডুকরে কান্না আসে। চোখ থেকে অশ্রু ঝরে।

যে কথা না বললে নয়, অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা একেবারেই নবীন। জানি, অনুবাদ একটি কঠিন বিষয়। তবুও লোভ সামলাতে পারি নি এ হৃদয়বিদারক কাহিনী পড়ে। ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি একান্ত কাম্য।

উল্লেখ্য, আমরা [অনুবাদক] নিজেদের বিশেষ কিছু দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে কিছু কিছু শব্দের বানানে ভিন্নতা অবলম্বন করেছি। পাঠকগণ এটাকে যেন বানানভুল না ভাবেন।

এই বই প্রকাশে যেসব বন্ধু-বান্ধব বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, স্রেফ নাম উল্লেখ করার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের এত বড় অবদানকে খাটো করতে চাই না। শুধু এটুকুই বলব, আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

যদি এ বই যালিম-মনুষ্যত্বহীনদের অপকর্ম সম্পর্কে কারো মনে সামান্যতম ধারণাও দিতে পারে এবং বইয়ে উল্লেখিত শহীদী দাস্তান পড়ে কোন ভাই নিজেকেও অনুরূপ কুরবানীর জন্য তৈরী করে নেন, তাহলেই ভেবে নেব আমাদের এ শ্রম সার্থক।

বিনয়াবনত

আলবাস

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমেরিকা যখন আফগানিস্তানে বিমান হামলা করে, তখন আমি ছিলাম কাবুলে। আমীরুল মুমিনীন আমাকে কান্দাহারে তলব করলেন। প্রতিরোধ-কৌশলের বিষয়ে পরামর্শ হল। আমার নিয়োগ দেয়া হল কান্দাহারের পাঞ্জেওয়াই এবং মায়বন্দ জেলায়, যেন ওখানকার প্রতিরোধ-শৃঙ্খলা মযবুত করি এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে বিষয়টি অবহিত করি। আমার পৌঁছার পরে মায়বন্দ এবং পাঞ্জেওয়াইতে মার্কিনীরা বম্বিং শুরু করে দিল। বিমানগুলো অনেক উঁচুতে থেকে বোমা নিক্ষেপ করত। আমাদের অস্ত্রের আওতার বাইরে ছিল বিমানগুলো। ফলে আমরা বিমান হামলা প্রতিহত করতে পারছিলাম না। মায়বন্দের সালেহান ও গর্মাবাক এলাকায় আরবদের অবস্থানসমূহকে লক্ষ্যস্থল বানিয়ে নেয়া হল। তিনটি গাড়ী বিধ্বস্ত হল। নারী ও শিশুসহ বার জন আরব শহীদ হলেন। নওরোযী, বাগপুল, তালেকান ইত্যাদি এলাকায় বোমাবর্ষণে পাঁচজন শহীদ হলেন।

দশ দিন পর আমার নিয়োগ দেয়া হল বাগলান-এ। কেননা উজবেকিস্তানের পথ 'মাযার-ই শরীফ'-এ মার্কিন হামলার পরিকল্পনার খবর আসছিল। যখন তালিবান ফৌজ উজবেক সীমান্তের নিকটস্থ হীরতান নৌবন্দর ও আমু দরিয়ার তীরে সমবেত হল, তখন আমেরিকা মাযার-ই শরীফের দক্ষিণে দুররায়ে সূফ এলাকায় হেলিকপ্টারের মাধ্যমে দোস্তামকে সহায়তা করতে আরম্ভ করল। তাদেরকে নতুন অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হল। এমনকি ঘোড়ার জন্য নতুন লাগামও জুটিয়ে দেয়া হল; যাতে মাযার-ই শরীফে অতর্কিতে আক্রমণ করে কব্জা করে নেয়া যায়। তালিবান ফৌজের এক বড় অংশকে উজবেক সীমান্ত

থেকে সরিয়ে এনে মাযার-ই শরীফের প্রতিরক্ষার জন্য দুররায়ে সূফ-এ সংগঠিত হতে থাকা দোস্তাম মিলিশিয়াদের মুকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হল। আমিও বাগলান থেকে দু'শ মুজাহিদের একটি বাহিনীসহ দুররায়ে সূফ পৌঁছলাম।

দুররায়ে সূফ-এ আমেরিকা দোস্তামের সাথে মিলে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছিল। বড় বড় হেলিকপ্টারের সাহায্যে তাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে সহায়তা করা হচ্ছিল। আমাদের মোর্চাগুলোতে দোস্তাম মিলিশিয়াদের পক্ষ থেকে বিশেষ কোন আক্রমণ হত না। কিন্তু মার্কিন বিমানগুলো দিনরাত বোমাবর্ষন অব্যাহত রাখছিল। শেষ দিনগুলোতে পরিস্থিতি এমন হল যে, যে সৈন্যরা সন্ধ্যায় মোর্চার হিফাযতের জন্য যেত, বোমাবৃষ্টির ফলে সকালে তারা শহীদ হয়ে যেত। আর যে তালিবান সকালে মোর্চার হিফাযতের জন্য যেত, সন্ধ্যায় খবর আসত যে, তাদের অধিকাংশ সাথী বোমাবর্ষণে শহীদ হয়ে গেছে। এহেন পরিস্থিতিতে মোর্চায় অবস্থান করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। সুতরাং নতুন রণকৌশল হিসাবে আমরা পুরনো মোর্চা ছেড়ে দিয়ে নতুন জায়গায় প্রতিরোধ-মোর্চা বানিয়ে নিয়েছিলাম। ওখানে আমার গ্রুপের শুধু ১৭ জন সাথী শহীদ হন। বাগলানের নাহরাইন জেলা থেকে খবর এল, উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সৈন্যরা আক্রমণ করতে যাচ্ছে। অয়্যার্লেসের মাধ্যমে সিপাহসালার মোল্লা ফযল আখন্দ-এর তরফ থেকে আমার নাহরাইন পৌঁছার নির্দেশ এল। আমার সাথীরা নাহরাইনে পূর্বেই উপস্থিত ছিলেন। আমি দুররায়ে সূফ রণাঙ্গনের কামান আমার সহ-কমান্ডার আবদুল গাফফারকে সোপর্দ করলাম এবং নাহরাইন রওনা হয়ে গেলাম। নাহরাইন পৌঁছেই দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল। সকল কমান্ডারকে সুবিন্যস্ত করা হল। রাতের শেষ প্রহরে বিরোধীরা তীব্র আক্রমণ করল। প্রতিউত্তরের জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। প্রচণ্ড যুদ্ধ

হল এবং দুই ঘণ্টার মধ্যে আমরা তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিলাম। আটটা লাশ, ডজন ডজন আহত লোক, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং মৃত ঘোড়ার এক বিশাল সংখ্যা ফেলে উত্তরাঞ্চলীয় জোট পালিয়ে গেল। তালিবানকে ঘেরাও করার জন্য দ্রুততার সাথে ঘোড়াসওয়াররা হামলা করে দিয়েছিল, যা সফল হয় নি।

ঐদিনই মাযার-ই শরীফের আশে-পাশে প্রচণ্ড বম্বিং এর খবর আসছিল। আমেরিকা এটম বোমার পর সবচেয়ে বড় বোমা ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছিল। দুররায়ে সূফ ও 'শোলগেরাহ' অজস্র প্রাণ-ক্ষয়ের পর তালিবানকে ছাড়তে হয়েছিল।

পরের দিন সন্ধ্যায় মাযার-ই শরীফ বিপর্যয়ের খবর আসে। মোল্লা ফযল আমাকে বাগলান পৌঁছার নির্দেশ দিলেন। যখন আমি বাগলান পৌঁছি, তখন সামানগানেরও বিপর্যয় হয়েছিল। মাযার-ই শরীফ থেকে সরে আসা তালিবান পুল খমরীতে একত্র হয় যখন তালিবানের একটি বড় অংশ বোমাবর্ষণে শহীদ হয়ে গেল। শুধু তাশকারগান থেকে পুল খমরী পর্যন্ত মার্কিন বিমানগুলো তালিবানের ৮৫টি গাড়ীকে 'গাইডেড মিসাইল'-এর নিশানা বানিয়ে তাতে আরোহী তালিবানকে শহীদ করে দিল। এরপর তালিবান গাড়ী রাস্তায় ছেড়ে পায়দল সফর শুরু করে দেয়। সামানগানের গভর্ণর মোল্লা আবদুল মান্নান হানাফী, পুলিশ প্রধান মোল্লা আবদুল আলী তাদের গাড়ী সামানগানে ছেড়ে দিয়ে পায়দল সফর করে পুল খমরী পৌঁছেন। কারণ মার্কিন বিমানসমূহ গাড়ীগুলোকে সহজেই নিশানা বানিয়ে নিচ্ছিল।

পরবর্তী রাতে কমান্ডারদের পরামর্শ সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, পুরো উত্তরাঞ্চল খালি করে বামিয়ানের পথে কাবুল যেতে হবে। এই ধারাবাহিকতায় কুন্দুজ থেকে কাবুলগামী পথকে আটভাগে বিভক্ত করা হল এবং প্রত্যেক ভাগের নিরাপত্তার দায়িত্ব বিভিন্ন কমান্ডারকে

অর্পণ করা হল। কেননা আশঙ্কা ছিল, বিরোধীরা পথ রুদ্ধ করে না দেয়। মোল্লা ফযল বাগলানের পুরাতন শহর থেকে পুল খমরী পর্যন্ত পথের দায়িত্ব আমার যিম্মায় দিলেন। পুল খমরী থেকে দোশী পর্যন্ত পথের দায়িত্ব মোল্লা আবদুল মান্নান হানাফী ও মোল্লা আবদুল আলীর যিম্মায় দেয়া হল। দোশী থেকে জানজান পর্যন্ত মোল্লা শাহযাদা। দোশী থেকে দুররায়ে কিয়ান পর্যন্ত তিনি মোল্লা আবদুল বাকীর সাথী হিসাবে নিযুক্ত হলেন।

দুররায়ে কিয়ান থেকে 'তালাহ্ বরফক' পর্যন্ত কমান্ডার বায মুহাম্মদ ও মওলভী আবদুস সালাম নিযুক্ত হলেন। বামিয়ানের দ্বি-মুখী রাস্তা থেকে জলরীয পর্যন্ত মোল্লা গোলাম নবী জিহাদ-ইয়ার নির্ধারিত হলেন। জলরীয থেকে দুর্দাক শহরের রণাঙ্গন পর্যন্ত পথের নিরাপত্তার দায়িত্ব কমান্ডার গোলাম মুহাম্মদ দুর্দাক-এর যিম্মায় ছিল।

এ পরিকল্পনার পর, দ্বিতীয় দিন মনযিলগামী তালিবান সৈন্যদের কাবুলের দিকে রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন বেলা দুইটায় খবর এল যে, করীম খলীলী ভারী শক্তি নিয়ে বামিয়ানে আক্রমণ করেছে এবং মওলভী আবদুস সালামকে সাথে নিয়ে বামিয়ান কব্জা করে নিয়েছে। বামিয়ানের বিপর্যয়ে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেল। আমাদের ফিরে যাওয়ার সম্ভাব্য সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। উত্তরাঞ্চলে পুনরায় একবার তালিবানের এক বিশাল বাহিনী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। এদিকে পুল খমরীতে মার্কিন বিমান বাহিনী প্রচণ্ড বম্বিং শুরু করে দিয়েছিল। বিমানগুলো 'লেওয়ায়ে টেংক' 'যেরাহ্দার' ও পার্শ্ববর্তী এলাকায়, যেখানে তালিবান অবস্থান করছিল, 'অগ্নিবর্ষণ' শুরু করে দিয়েছিল।

মার্কিন বিমান বাহিনী তালিবানের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ তীব্র করে দিল। বামিয়ানের পর সন্ধ্যায় জানজান- এরও বিপর্যয় হল। শুরায়ে নেযাম-এর জেনারেল কবীর 'নাহরাইন' থেকে আক্রমণ

করে 'জানজান' দখল করার পর, দোশী ও পুল খমরীর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে দেয়। মোল্লা শাহযাদা, যিনি দোশী ও জানজান-এর প্রতিরক্ষায় ছিলেন, বামিয়ানের পথ রুদ্ধ হওয়ায় এবং নাহরাইন থেকে জেনারেল কবীরের অগ্রসর হওয়ার কারণে দোশীতে সময়ক্ষেপণ করা যথার্থ মনে করলেন না। তিনি মাগরিবের পর সাথীদেরকে জানজান থেকে বের করে পুল খমরীর দিয়ে রওনা করে দিলেন, যাতে তারা অবরোধে পড়ে না যান। এদিকে রাত ১১টায় পুল খমরীও তালিবানের হাতছাড়া হয়ে গেল। বিরোধীদের একটি গ্রুপ গোপনে প্রবেশ করে শহরের কেন্দ্রীয় চৌকির আশে-পাশের ভবনগুলোতে মোর্চা তৈরী করে নিল। তালিবানের কয়েকটা গাড়ীকে তারা নিশানা করল। ইতোমধ্যে শহরে আত্মগোপনকারীরাও অস্ত্রসজ্জিত হয়ে লুটপাট ও গাড়ী হাইজ্যাকের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। তালিবান পুল খমরী থেকে বাগলানের দিকে রওনা হয়ে যায়। বাগলানের জনসাধারণ বিদ্রোহ না করে বরং তারা সহযোগিতা করেছে। মোল্লা শাহযাদা নিজ কাফেলাসহ দোশী থেকে পুল খমরী পৌঁছলেন। বিরোধীরা তা কব্জা করে নিয়েছিল। মূল শহরের দিকে অগ্রসর হতেই মোল্লা শাহযাদার বাহিনীর উপর ফায়ারিং করা হয়। কতক সাথী আহত হলেন এবং সবাই শহরের বাইরেই বাধাপ্রাপ্ত হলেন। পরিস্থিতি ভীষণ সঙ্কটাপন্ন হয়ে গেল। হাই কমান্ডের তরফ থেকে মুহূর্তকালও বিলম্ব না করার নির্দেশ এসেছিল। শাহযাদা এহেন সঙ্গীন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ওখানে বেশীক্ষণ অবস্থান করা সমীচীন মনে করেন নি। কেননা দোশীর দিক থেকে জেনারেল কবীর বিরাম না দিয়ে এগিয়ে আসছিল। সম্মুখেও পথ রুদ্ধ; উপর থেকে বিমান বাহিনী বোমা 'বর্ষণ' করেই চলছিল। সব মুজাহিদ অবরোধে আটকে পড়ার ভয় ছিল। মোল্লা শাহযাদা ছিলেন নির্ভীক, অভিজ্ঞ ও উপস্থিত-বুদ্ধিসম্পন্ন কমান্ডার। যুদ্ধে তিনি কয়েকবার আহতও হয়েছিলেন।

তখনও তাঁর পাঁজরে ক্ষত ছিল। তিনি হিম্মত হারালেন না; গাড়ী ওখানেই রেখে পুল খমরীর উত্তর দিকের পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে ৩৩০ জন মুজাহিদসহ বাগলানের দিকে চলে গেলেন। মোল্লা শাহযাদা পাহাড়ী পথ চেনার জন্য স্থানীয় এক লোককে জাগিয়ে তুলে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পুল খমরীর পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার পর তালিবান বাগলানও ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। কেননা বিরোধীরা নাহরাইন কব্জা করার পর বাগলানে অবস্থান করা মুশকিল ছিল। সুতরাং সবাই কুন্দুজ রওনা হন। আমি রাত ১ টায় বাগলান থেকে কুন্দুযের উদ্দেশে রওনা হই। মোল্লা ফযল বাগলান ও কুন্দুজের মধ্যবর্তী আলী আবাদ **নামক স্থানে** প্রতিরোধ-ক্যাম্প তৈরীর সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এবং মোল্লা মুজাহিদকে সেই ক্যাম্পের দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। মাযার-ই শরীফ, তাখার, পুল খমরী ইত্যাদি এলাকা থেকে সরে আসা তালিবান কুন্দুজে সমবেত হয়ে গেল। বিরোধীরা বিভিন্ন দিক থেকে শহরে আক্রমণ শুরু করে দেয়। মার্কিন বিমান বাহিনী দিনরাত কুন্দুজ ও তার চারপাশে বোমাবর্ষণ করতে থাকে। তালিবান স্থল-হামলা তো প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বিমান হামলা প্রতিরোধ করতে পারছিলেন না। বিমান বাহিনীর মুকাবিলা করা সাধারণ ব্যাপার ছিল না।

এমন সময়ে উত্তর আফগানিস্তানের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় পশতুন ও উজবেক কমান্ডার, যারা তালিবানের ব্যাপারে বেশ সহমর্মী ছিলেন এবং তাদের মাঝে পারস্পরিক সু-সম্পর্কও ছিল, তারা দোস্তামের প্রস্তাব নিজ দায়িত্বে তালিবানের সামনে পেশ করলেন যে, যদি তালিবান তাদের বড় অস্ত্রশস্ত্র এবং গাড়ীবহর দোস্তামের হাওলা করে, তাহলে সে তাদেরকে মাযার-ই শরীফ থেকে হেরাতের পথে কান্দাহার যাওয়ার সুযোগ করে দেবে। দোস্তামের পক্ষ থেকে জামিনদাতা কমান্ডারদের মধ্যে আরবাব হাশেম, আমের লতীফ,

পীরাম কল্, গওছুদ্দীন, শামসুল হক এবং কমান্ডার আবেদী অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তারা এ ব্যাপারে বেশ আশ্বস্ত করলে মোল্লা ফযল আখন্দ নিজ কমান্ডারদের পরামর্শ সভা ডাকলেন এবং দোস্তামের প্রস্তাব সামনে রাখলেন।

দোস্তামের এ প্রস্তাবের বিষয়ে চিন্তা করা এ জন্যও উপযুক্ত মনে করা হল যে, কুন্দুজে অবরুদ্ধ থেকে দীর্ঘ যুদ্ধের ফায়দা ছিল না। অস্ত্রশস্ত্র নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল, রসদপত্রও ফুরিয়ে আসছিল। পরামর্শ সভায় কমান্ডারগণ ভিন্ন ভিন্ন মত দিলেন। কেউ বলছেন, আমরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে করে শহীদ হব। কেউ কেউ সন্ধির পক্ষে ছিলেন বিধায় পরস্পর মতপার্থক্য হতে থাকল। শেষে উলামায়ে কিরামের নিকট বিষয়টি পেশ করার মাশওয়ারা হল, যাতে আলিমগণের ফায়সালা সবাই মেনে নেন। সংযোগ মাধ্যমে উলামায়ে কিরামের নিকট ফাত্ওয়া প্রার্থনা করা হল। মওলানা অব্দুল আলী দেওবন্দী, মওলভী সদওয়াযীয়ে আগা এবং মওলভী নূর মুহাম্মদ টেলিফোনের মাধ্যমে জবাব দিলেন যে, যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে যদি বিজয়ের কোন সম্ভাবনা না থাকে, তবে সন্ধি করা জাইয। উলামায়ে কিরামের ফায়সালা সব কমান্ডারকে ধারণ করে শুনানো হল, যা সবাই স্বীকার করলেন।

যখন সন্ধির ফায়সালা হল, তখন তালিবানের মাশহূর বাহাদুর কমান্ডার মোল্লা দাদ উল্লাহ মজলিস থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং সবাইকে সম্বোধন করে নিজ কালাশিনকভ ও রুশ নির্মিত পিস্তল দেখিয়ে বললেন, 'আমি কিছুতেই আমার এ হাতিয়ার দোস্তামের হস্তগত করব না। জীবন থাকতে আমি দোস্তামের মুখ দেখতে চাই না।' মোল্লা দাদ উল্লাহ মোল্লা ফযলকে বললেন, 'আপনি আমাকে আল্লাহর সোপর্দ করে বিদায়ের অনুমতি দিন।' মোল্লা দাদ উল্লাহ সন্ধিচুক্তি বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই বলখের একজন কমান্ডারের

গাড়ীতে তিনজন সাথীসহ গোপনে রওনা হয়ে গেলেন। তিনি মাযার-ই শরীফ অতিক্রম করে বলখের এক গ্রামে গিয়ে অবস্থান নিলেন। মোল্লা দাদ উল্লাহ কুন্দুজে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করেছিলেন। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের লোকেরা ছিল তাঁর প্রচণ্ড জানী দুশমন। দোস্তাম সন্ধির মাঝে শর্ত রেখেছিল যে, বিদেশী অর্থাৎ আরব, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান ইত্যাদি এলাকার মুজাহিদীনকে সে যেতে দিবে না। সন্ধিচুক্তির প্রয়োগ শুধু 'আফগানিস্তানের' তালিবানের ক্ষেত্রে হবে; অন্যান্য বিদেশী মুজাহিদীনকে সে গ্রেফতার করবে। মোল্লা ফযল অনেক চেষ্টা করলেন, যেন দোস্তাম বিদেশী তালিবানকে যেতে দেয়। কিন্তু সে সম্মত হয় নি। আমরা বিদেশী মেহমান মুজাহিদদের ব্যাপারে কঠিন পেরেশানীতে পড়ে গেলাম। তাদেরকে নিরাপত্তা সহকারে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা-তদবীর চলতে থাকল।

শেষ পর্যায়ে মোল্লা ফযল বলখের কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং বিদেশী মুজাহিদীনকে গোপন পথে হিফাযতের সাথে বের করে নেয়ার ইনতিযাম করে ফেললেন। দোস্তামের সাথে সন্ধিচুক্তি বাস্তবায়িত হওয়ার স্রেফ একদিন পূর্বে মোল্লা ফযল আমাকে ডেকে পরিকল্পনার বিষয়ে অবগত করলেন এবং ৬শ' বিদেশী তালিবানকে আমার যিম্মায় দিলেন, যেন আমি তাদেরকে গন্তব্য পর্যন্ত পৌছিয়ে দিই। আমি হালকা অস্ত্রসহ বড় ট্রাক ও গাড়ীগুলোতে বিদেশী মুজাহিদদেরকে নিয়ে কুন্দুজ থেকে চারদুররাহ পৌছলাম। আমাদের বেশ সতর্কতার সাথে সফর করতে হচ্ছিল। আঁধার ছড়িয়ে পড়তেই রাতেরবেলা সিপাহ্সালার মোল্লা ফযল আখন্দ আমাদের দুআ করে ইয়ারগাং পুল পর্যন্ত বিদায় দিতে আসলেন। আমরা মোল্লা ফযলের সাথে বিদায়ী মুলাকাত করি এবং বিজন প্রান্তরে সফর শুরু করি। পথিমধ্যে বলখের শমক-এর কমান্ডারের সাথে সাক্ষাত হল, যিনি মোল্লা দাদ উল্লাহকে নিরাপদ স্থানে পৌছিয়ে কুন্দুজে ফিরে

আসছিলেন। তিনি আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য নিজের সহযোগী কমান্ডার করীম আগাকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। রাতের শেষ প্রহরে আমরা তাশকারগান পৌঁছলাম। দোস্তামের প্রহরীরা আমাদেরকে ফটকে আটকে দিল। কমান্ডার করীম আগা নেমে গিয়ে তাদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। ফটক খুলে দেয়া হল। আমরা রওনা হয়ে গেলাম। আমাদের গন্তব্য ছিল বলখ। মাযার-ই শরীফ দিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে 'হীরতান'-এর দ্বি-মুখী পথ ঘুরে মাযার-ই শরীফ থেকে বের হয়ে আমাদের কাঁচা রাস্তায় অতিক্রম করার কথা ছিল। কিন্তু শমক-এর কমান্ডার আমাদেরকে হীরতান-এর দ্বি-মুখী পথ দিয়ে সোজা মাযার-ই শরীফ নিয়ে গেলেন। আমার সন্দেহ হল.....।

মাযার-ই শরীফ বিমানবন্দরের নিকটস্থ ফটকের সামান্য আগে আমাদের কাফেলা থেমে গেল। কমান্ডার করীম আগা এই বলে ফটকের দিকে চলে গেলেন যে, আমি সামনে দেখে আসি কী পরিস্থিতি? ফজরের সময় হয়ে গেল। আমরা সবাই তায়াম্মুম করে নামাযে মাশগুল হলাম। আমরা পানাহার ব্যতিরেকেই রোযাও রেখে দিয়েছিলাম। কমান্ডার করীম আগা ফিরে এসে সংবাদ দিলেন যে, দোস্তামের নিকট আমাদের আগমনের সংবাদ পৌঁছে গেছে। কিন্তু আমি মনে করছি, কমান্ডার করীম আগা গাদ্দারী করেছে। আমি নিশ্চিত, সে যে-কোন প্রকারে আমাদের আগমনের খবর দোস্তামের কাছে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। হালকা হালকা আলো ছড়িয়ে পড়লে রাস্তার দু'পাশের সাহারায় কিছু নড়াচড়া আমাদের অনুভূত হল। আলো যখন কিছুটা বাড়ল, তখন টের পেলাম যে, আমরা পরিপূর্ণ ঘেরাওয়ে এসে গেছি। আমাদের চারদিকে দূরবর্তী ময়দানে সশস্ত্র সৈন্যরা নিজ নিজ অবস্থান নিয়ে নিয়েছিল। মাযার-ই শরীফের দিক থেকে ট্যাংক আসাও শুরু হয়ে গেল। আকাশে বিমান ও হেলিকপ্টার

সাড়ম্বরে নীচু হয়ে উড়তে লাগল। বিশাল আকারের মার্কিন বিমানগুলো আকাশে চক্কর দিয়ে আমাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে লাগল। এসব এত দ্রুত ঘটল, যেন পূর্বপরিকল্পিত এবং নিশ্চিতভাবেই আগ থেকে তারা পরিকল্পনা করে রেখেছিল। এখন আমরা ওখান থেকে বের হয়ে কোথাও যেতে পারছিলাম না। আমরা বিদেশী মেহমান মুজাহিদদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার যে পরিকল্পনা করেছিলাম, তা মনে হয় ব্যর্থ হতে চলল।

আমি মোল্লা ফযল আখন্দ, মোল্লা আব্দুল কাইয়ূম এবং আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদের সাথে অয়্যার্লেসে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করলাম। মোল্লা আব্দুল কাইয়ূম পরামর্শ দিলেন যে, অস্ত্র সমর্পণ না করে লড়ে যাও। মোল্লা ফযল এবং আমীরুল মু'মিনীন বললেন, এ মুহূর্তে যুদ্ধ করা অর্থহীন। কেননা কুন্দুজে অবস্থানরত তালিবানের ক্ষতি হবে। তোমরা যুদ্ধ না করে অস্ত্র সমর্পন কর। মোল্লা ফযল বললেন যে, 'আমি বলে দিয়েছি, তোমরা অস্ত্র দিয়ে দাও, কমান্ডার আমের জান তোমাদেরকে বল্‌খ নিয়ে যাবেন।' দোস্তামের পক্ষ থেকে পাঁচজন উর্ধ্বতন প্রতিনিধি আমার কাছে আলোচনার জন্য এসেছিল। যাদের মধ্যে কমান্ডার নাদের আলী হাজারাহ্‌, কমান্ডার আসাদ হাজারাহ্‌, কমান্ডার হুমায়ূন ফৌজী, কমান্ডার আমের জান এবং আরেকজন ছিল কমান্ডার উস্তাদ আতার প্রতিনিধি। তিনটি আলোচনা বৈঠক হল, যা চার ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। তাদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এই ছিল যে, তোমরা এদিকে কেন এসেছ, এখনো তো চুক্তি সম্পাদনার সময় বাকী আছে। তোমরা না জানিয়েই চলে এলে যে! আমি নিজের আগমনের বৈধতা বর্ণনা করে তাদেরকে উত্তর দিলাম যে, মার্কিন বিমানগুলোর প্রচণ্ড বম্বিং হচ্ছিল। ওখানে অবস্থান করা ছিল মুশকিল। এ কারণে আমরা এদিকে চলে এসেছি। তারা আমাদের অস্ত্র একত্রিত করতে লাগল। আরবরা অস্ত্র

সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানাল। তাদের জেদ ছিল যে, অস্ত্র সাথে নিয়ে যাব অথবা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে শাহাদাতে অমীয় সুধা পান করব। আমি মোল্লা ফযল আখন্দ এর সাথে যোগাযোগ করি। তিনি অয়্যার্লেসে কমান্ডার আমের জান, যিনি বলখের পাখতুন বংশোদ্ভূত ছিলেন, তার সাথে আলোচনা করলেন। কমান্ডার আমের জান অস্ত্র সমর্পণের ক্ষেত্রে মুজাহিদীনকে দোস্তামের হাওয়ালা করার পরিবর্তে নিজের সাথে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। মোল্লা ফযল আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি নিজের অস্ত্র কমান্ডার আমের জানের হাওয়ালা করে দাও। সে তোমাদেরকে বলখ পৌঁছিয়ে দিবে।

শীত ছিল তীব্র। আমরা সবাই পানাহার ব্যতিরেকেই রোযা রেখেছিলাম। দোস্তামের লোকেরা সিগারেট পান করছিল। গোটা দিন ওযুর জন্য পানি মিলল না। আমরা যোহরের নামায পড়লাম তায়াম্মুম করে। আমাদের থেকে ছোট গাড়ীগুলো নিয়ে নেয়া হল। তারপর কমান্ডারদের তাগাদায় মুজাহিদরা সমুদয় অস্ত্র এক জায়গায় জমা করতে শুরু করল। অস্ত্র রাখার পর দোস্তাম এল। সে দূর থেকে অস্ত্রের স্তুপ দেখল এবং মুজাহিদদেরকে ট্রাকে তুলে রওয়ানা হবার নির্দেশ দিল। মুজাহিদদের তল্লাশী না নিয়ে এবং হাত না বেঁধে ট্রাকে তুলে দেয়া হল। শহরের প্রথম চেকপোস্টের নিকট দোস্তাম দাঁড়ানো ছিল। তার সঙ্গে আর কিছু মার্কিন সাংবাদিকও ছিল। ফটক থেকে শহর এবং শহর থেকে কিল্লা-ই জঙ্গী পর্যন্ত সড়কের উভয় পাশে সশস্ত্র সদস্যদের দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছিল। অনেক বিদ্রুপকারীও উপস্থিত ছিল, যারা কয়েদীদের গাড়ীতে পাথর মারত, তাদেরকে থু থু দিত এবং গালি দিত। কতিপয় লম্পট যুবক তাদের সদ্য মুণ্ডানো দাড়ির উপর হাত তুলিয়ে ঠাট্টা করত যে, 'রে তালেব! দেখ আমরা দাড়ি কামিয়ে ফেলেছি!' চেকপোস্ট অতিক্রম করতেই সড়কের উভয় দিকের সশস্ত্র বাহিনী ও গাড়ীগুলোর রোখ বলখের

পরিবর্তে অন্য কোনদিকে দেখে আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, আমাদের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী আমাদের যেতে দেয়া হচ্ছে না। লোকদের হাবভাব ও দোস্তামের বিশ্বাসঘাতকতা দেখে আমি ট্রাকে যেতে যেতে মনে মনে দোয়া করলাম, "ইয়া আল্লাহ! তুমিই জান যে, আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার রাস্তায় তোমার দ্বীনের শির উচ্চ করার জন্য বের হয়েছি। আমি নিজ গৃহ থেকে কোন জায়গা, দোকান কিংবা পার্থিব ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বের হই নি। তুমি আমাকে শাহাদাত নসীব কর অথবা রেহাই দান কর। আমি তোমার ফায়সালায় রাজী আছি।" প্রত্যেক সাথীর চোখে ছিল অশ্রু। ভাবালুতা প্রকাশ পাচ্ছিল। সন্ধ্যার সময় আমাদের কাফেলাকে কিল্লা-ই জঙ্গী পৌঁছিয়ে দেয়া হল। অথচ অস্ত্র সমর্পণের আগে আমাদেরকে বলখ পৌঁছানোর ওয়াদা করা হয়েছিল। আমাদের গাড়ী কিল্লা-ই জঙ্গীতে ঘোড়া যেখানে ছিল, ওখানে গিয়ে থামল। কোন কয়েদীর বিনানুমতিতে অবতরণ করার অনুমোদন ছিল না। সর্বাগ্রে নাম ডাকা হল আমার। আমি নীচে নামলাম তো কমান্ডাররা আমাকে সাথে দাঁড় করিয়ে রাখল। মুজাহিদদেরকে এক এক করে গাড়ী থেকে নামানো হল এবং পোষাক তল্লাশী করা যেতে লাগল। কয়েদীদেরকে তল্লাশীর পরে যমীনের একদিকে বসিয়ে দেয়া হত। তাদের পকেট থেকে বের হওয়া টাকা ও সামান চাদর বিছিয়ে তাতে রাখা হল। কয়েদীদের বুট, কোট, টুপি, পাগড়ী, রুমাল ইত্যাদি সবকিছু ফেলা হচ্ছিল। সামানের স্তুপ বনে গেল। ঘটনাস্থলে একজন মার্কিন পুরুষ সাংবাদিক ও মহিলা সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন, যারা ছবি তুলছিলেন। মাগরিবের নামাযের সময় সংকীর্ণ হয়ে আসছে দেখে আমি কমান্ডার আমের জান এবং নাদের আলী প্রমুখের কাছে নামায পড়ার অনুমতি চাইলাম। তারা নামায পড়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করল। ইত্যবসরে আরব কয়েদীদের গাড়ীর বহর এল।

দু'জন আরবের তল্লাশী নেয়া হল। তৃতীয় জন নেমে কিছুটা দূরত্বে গিয়ে সামান্য সময় থামল এবং তারপর হাতে হ্যান্ড গ্রেনেড ধরে সামনে বাড়ল যা সে পকেটে লুকিয়ে রেখেছিল। আমার পাশে প্রায় ৪ মিটার সীমানার মধ্যে তল্লাশী গ্রহণকারীদের সাথে কমান্ডার নাদের আলী-পুলিশ প্রধান মাযার-ই শরীফ এবং হিযবে ওয়াহ্‌দাতের কমান্ডার আসাদ হাযারাহ দাঁড়িয়ে তদারক করছিল। আরব মুজাহিদ পিন বের করে হ্যান্ড গ্রেনেড হাতের তালুতে রাখল এবং বাহু বাড়িয়ে দিল। সামনে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল। আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম। আমার কোন ধরনের চোট লাগে নি। পাশে দাঁড়ানো পুলিশ প্রধান নাদের আলী এবং কমান্ডার আসাদ হাযারাহ বিস্ফোরণের চোটে ৫ মিটার দূরে গিয়ে পড়ল। তাদের দেহ উড়ে গেল এবং বোমা নিক্ষেপকারী আরব মুজাহিদও শহীদ হয়ে গেল। ওরা মুহূর্তেই পলায়নপর হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। হিযবে ওয়াহ্‌দাতের উভয় কমান্ডার নিহত হয়েছিল। হাযারাহ গোত্রের বন্দুকধারীরা আমাকে ধরে ফেলল এই বলে যে, আমাদের কমান্ডারদের তুমিই হত্যা করেছ। কারণ তুমি তাদের পাশে দাঁড়ানো ছিলে। তারা তো মারা গেল আর তুমি নিরাপদ থেকে গেলে। আমি ওদের বললাম যে, হামলাকারী যমীনে পড়ে থাকা এই আরব ছিল। ওরা আমাকে বন্দুকের বাঁট মেরে নিজের রাগ ঝাড়ছিল। এমতাবস্থায় আমার এই চেষ্টা ছিল যে, আমি কোন রকমে নিজেকে তালিবান কয়েদীদের মধ্যে শামিল করে নেই আর তাদের ভিতরে মিশে যাই। কেননা, আমাকে তালিবান কমান্ডার হিসেবে সনাক্তকারী উভয় কমান্ডার নাদের আলী ও আসাদ হাযারাহ নিহত হয়েছিল। তাদের পর আমাকে আর কেউ চিনতে পারছিল না। হাযারাহ গানের যুদ্ধংদেহীরা চরম ক্ষুব্ধতা নিয়ে নিজ কমান্ডারদের লাশের দিকে মনোযোগী হল। আমি ধীরে ধীরে হেঁটে কয়েদীদের 'মজমা'র দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ওরা আমাকে

দেখে বন্দুক তাক করত, আমি মাটিতে শুয়ে পড়তাম। আবার উঠে বসতাম, ওরা সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তাক করত। এভাবে আমি কয়েদীদের মজমায় পৌঁছে যেতে সফল হলাম। আমি কয়েদীদের মাঝে হারিয়ে গেলাম। আমি আমার সাথীদের বুঝিয়ে দিলাম যে, এখন আমি কমান্ডার নই বরং সাধারণ কয়েদী। আমি নাম পাল্টিয়ে দিলাম। এখন থেকে আমাকে আব্দুল গাফফার নামে ডাকা হবে।

আমরা এই হিটলার বাজির সময় মাগরিবের নামায পৃথক-পৃথকভাবে তায়াম্মুম করে পড়লাম। অন্ধকার ছেয়ে যাচ্ছিল। হাযারাহ গানের সশস্ত্র লোকেরা যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে এল। তারা আমাদের উপর বন্দুক তাক করে ফায়ার করতে যাচ্ছিল, এমতাবস্থায় দোস্ত ামের উজবেক সিপাহী প্রতিবন্ধক হয়ে গেল। তারা আমাদেরকে বাঁচিয়ে নিল। উজবেক সৈন্যরা হাযারাহ গান যুদ্ধবাযদেরকে কঠোরতার সাথে দূরে ঠেলে দিল। উজবেক সৈন্যরা মাঝখানে এসে হাযারাহ্ গানের যুদ্ধবাযদের উপর গান তাক করল। তাদের পরস্পর সংঘর্ষ হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে গেল।আঁধারী ছেয়ে যেতে থাকে। কিল্লায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিযবে ওয়াহ্দাতের কমান্ডারদের নিহত হওয়ার খবর শুনে দলে দলে সশস্ত্র বাহিনীর কিল্লায় প্রবেশ শুরু হয়ে যায়। সশস্ত্র যোদ্ধারা প্রতিশোধ নিতে অগ্নিশর্মা হয়ে কয়েদীদের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। কয়েদীরা দেয়াল ঘেঁষে ঘাসের উপর ভয়ে ভয়ে বসে অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুখোমুখী হচ্ছিল। বড় কমান্ডারদের অনুপ্রবেশে সাময়িকভাবে রক্তারক্তি থেমে গেল। আরো একবার কয়েদীদের উপর তল্লাশীর ধারা আরম্ভ করা হল।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে দেয়া হল। তল্লাশীতে নির্দয়তা ও কঠোরতা করা হতে লাগল। তল্লাশীর পর ছয় শত কয়েদীকে একটি সংকীর্ণ ও অন্ধকার বাঙ্কারে বন্দী করে রাখা হল। এই ছোট বাঙ্কারে জায়গা ছিল কম। সবাই বসে বসে রাত কাটালাম। পা লম্বা

করে শুতে পারছিলাম না। স্থানের সংকীর্ণতা ও অন্ধকারের কারণে কষ্টের তীব্রতা আরো বেড়ে গেল। রুটি ছিলনা, পানি ছিল না। সবার মুখ শুকিয়ে গেল, দুর্বলতা বেড়ে গেল।

আজ ছিল দ্বিতীয় রাত। আমরা ছিলাম ক্ষুধার্ত। দিনে রোযা রেখেছিলাম পানাহার ব্যতিরেকেই। প্রত্যেকে ইশার নামায স্ব স্ব স্থানে বসে তায়াম্মুম করে ইশারা করে আদায় করলাম। সিজদার জায়গা পর্যন্ত ছিল না। আরব মুজাহিদীন আমাকে অভিযোগ করতে লাগল যে, আমরা আপনার কথায় তাদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করলাম, আর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদেরকে গ্রেফতার করে কিল্লায় বন্দী করল। আমি আরব মুজাহিদদেরকে উত্তরে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলতাম যে, এখন তো আমি অসহায়। কিছুই তো করতে পারছি না। আমিও আপনাদের সাথে বন্দী।

রাত দশটার মত হবে। বাঙ্কার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে গর্জে উঠল এবং বারুদের ধোঁয়া ও গন্ধে ভরে গেল। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের রক্তপিপাসু যোদ্ধারা বাতি জ্বেলে হ্যান্ড গ্রেনেড ভিতরে ছুঁড়ে মেরেছিল। যার ফলশ্রুতিতে সাত জন তালিবান ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে গেল। আহতদের এক বড় অংশ সারা রাত আঘাতের কারণে কাতরাচ্ছিল। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছিল না যে, কে কতটুকু আহত হয়েছে? রাতটা বসে বসে অস্থিরতার সাথে যাপিত হল। যিকির ও তিলাওয়াত করতে করতে ফজর হয়ে গেল। ফজরের নামায তায়াম্মুম করে বসে বসে আদায় করলাম।

২৫ নভেম্বর সকাল হতেই এক এক কয়েদীকে পর্যায়ক্রমে বাঙ্কারের বাইরে এনে তল্লাশী নিয়ে এবং হাত বেঁধে এলোপাথাড়ি মারতে মারতে অজ্ঞাত স্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া শুরু হল। কয়েদীদের আশংকা ছিল যে, হত্যা করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেলা এগারোটা বেজে গেল। বাঙ্কারে আমরা স্রেফ পঞ্চাশ জন কয়েদী

অবশিষ্ট ছিলাম। আচানক বাইরে থেকে তাকবীর বুলন্দ হওয়ার আওয়াযের সাথে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল এবং সাথে সাথেই গুলী শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধ তখন শুরু হল যখন হিযবে ওয়াহ্দাতের সাথে সম্পৃক্ত হাযারাহ বংশের এক যুদ্ধবায আরব মুজাহিদের তল্লাশীকালে তার পকেট থেকে পবিত্র কুরআন বের করে জিজ্ঞাস করল যে, এটা কী? আরব মুজাহিদ জবাবে বলল, এটি কুরআন মাজীদ। বদবখ্ত হাযারাহ যুদ্ধবায অবজ্ঞার সুরে অপবিত্র উচ্চারণ করতে করতে পবিত্র কুরআন দূরে ছুঁড়ে মারল। আরব মুজাহিদ কুরআন পাকের লাঞ্চনা বরদাশ্ত করতে পারল না। সে পিছনে দাঁড়ানো অন্য এক আরব মুজাহিদকে ইঙ্গিত করল যে পূর্ব থেকেই হ্যান্ড গ্রেনেড লুকিয়ে রেখেছিল। সে নারা লাগিয়ে হ্যান্ড গ্রেনেডের পিন বের করে হাযারাহ যোদ্ধাদের দিকে ছুঁড়ে ছিল। বিস্ফোরণে কয়েকজন উড়ে গেল। অবশিষ্ট যোদ্ধা ব্যস্তসমস্ত হয়ে নিজের গান ওখানে ফেলে ভীত বিহবলিত হয়ে উল্টোপায়ে পালাতে লাগল। ছাদে ও চূড়ায় আগ থেকে মোতায়েনকৃত বন্দুকধারীরা চারদিক থেকে তালিবানের উপর ফায়ার শুরু করল। আরব মুজাহিদরা তাদের বন্দুক ছিনিয়ে নিল এবং নীচু হয়ে অস্ত্র তুলে বীর পুরুষোচিত মুকাবিলা শুরু করে দিল।

ফায়ারিং তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। এত প্রচণ্ড ফায়ারিং শুরু হয়ে গেল যে, আমরা মাথা তুলে বাইরে তাকাতে পারছিলাম না। কিল্লার চারদেয়ালে ও চূড়ার উপর দাঁড়ানো উত্তরাঞ্চলীয় যোদ্ধারা পিছমোড়া করে বাঁধা নিরস্ত্র কয়েদীদের উপর বৃষ্টির মত গুলী বর্ষণ করতে লাগল। এভাবে যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। আমরা নামায পড়লাম। সূরা ইয়াসীন পাঠ করলাম। আল্লাহর কাছে মদদ চেয়ে সমস্ত সাথী পরস্পর গলাগলি করে মাফ বিনিময় করলাম এবং আখেরী মুলাকাত হিসাবে মিলতে লাগলাম। আমরা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, বের করা সমস্ত কয়েদীকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে।

আর এখন আমাদেরকেও হত্যা করা হবে। আচমকা বাঙ্কারের বন্ধ দরজা খুলে গেল এবং এক আরব মুজাহিদ ভিতরে প্রবেশ করল। সে তার উভয় হাতে পাথর উঠিয়ে নিয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম, কী হল? সে জবাবে বলল, "আলহামদু লিল্লাহ কামিয়াবী শুকরান" আমি আরব মুজাহিদের কথা শুনে দাঁড়ালাম এবং তার সাথে বাইরে বের হলাম। বাকী সাথীদেরকে অপেক্ষা করার জন্য বলে দিলাম। যখন বাঙ্কার থেকে বের হলাম তখন 'কিয়ামতে ছুগরা'-র দৃশ্য ছিল। কিল্লার মাঝখানে দূর দূর পর্যন্ত শহীদদের লাশ বিক্ষিপ্ত পড়ে ছিল, শহীদদের হাত পিছমোড়া বাঁধা ছিল, (আরব মুজাহিদ হয়ত শাহাদাতকে কামিয়াবী বলছিল।) শহীদদের মাঝখানে পড়ে থাকা অনেকে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে কাতরাচ্ছিল। বিশ জন নিরাপদে থাকা তালিবান সম্মুখস্থ দেয়ালের সাথে বসা ছিল, তাদের হাত পিছনে বাঁধা ছিল। আর কিছু তালিবান গর্তের ভিতর লুকিয়ে ছিল। তাদের কাছে গান ছিল আর তারা মুকাবিলা করছিল। চূড়া থেকে এবং চারদিক থেকে ফায়ারিং অব্যাহত ছিল। উত্তরাঞ্চলীয় জোট নিরস্ত্র কয়েদীদের রদ্দে আমল বরদাশত করতে পারছিল না। তখন তারা তাদের কাবু করার জন্য মার্কিন বিমানের সাহায্য তলব করল। যোহরের নামাযের পর বিমান সাড়ম্বরে কিল্লার দক্ষিণ দিকের অংশে বোমা বর্ষণ করতে লাগল। দোস্তামের ট্যাংক কিল্লার উত্তর দিকের অংশ থেকে সামনে এগিয়ে গোলা বর্ষন করতে লাগল। বাইরে থেকে কিল্লার ভিতরে মর্টার তোপ থেকেও গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। ট্যাংক, তোপ ও বিমান একযোগে অগ্নিবৃষ্টিতে লিপ্ত ছিল। চারদিক ধোঁয়া আর ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল। ধুলা উড়তে লাগল সবেগে। ঐ ধুলাবালির কারণে আমাদের চলাফেরা সহজ হয়ে গেল। এ থেকে সুযোগ গ্রহণ করে মুকাবিলাকারী মুজাহিদীন এদিক-ওদিক আসা যাওয়া করছিল এবং তারা দুশমনের গুলী থেকে নিরাপদ ছিল।

ইত্যবসরে একজন আহত আরব মুজাহিদ আমার কাছে এল যার কর্তিত হাত ঝুলছিল। শুধু চামড়ার সাথে লেগে ছিল। তার কথা ছিল, আমার হাতটা কেটে ফেল। হয়ত তার মনে হযরত মা'আয (রাঃ) এর সুন্নাতের উপর আমল করার খেয়াল এসেছিল। আমি তার ঝুলন্ত হাত তার বাহুর সাথে বেঁধে দিলাম। যখন আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম যে, খুব কষ্ট হচ্ছে না তো? তখন সে জবাবে "আলহামদু লিল্লাহ শুকরান" "জুড়েম জুড়েম" (আল্লাহর শোকর আমি সুস্থ আছি, একদম সুস্থ আছি) বলতে বলতে বলতে ফের লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে খন্দকের (পরিখা) দিকে চলে গেল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বাঙ্কার থেকে বের করে বাইরে আনা তালিবান ও আরব মুজাহিদদেরকে কাতারে বসিয়ে মার্কিন সিআইএ-র দু'জন অফিসার তদন্ত করছিল। সিআইএ এজেন্ট ছবি তুলছিল আর ভিডিও ফিল্ম তৈরী করছিল। ঐ দুই অফিসারের হাঁটুতে পিস্তল বাঁধা ছিল। একজন আফগানদের বেশ ধারণ করেছিল আর দাড়ি রেখেছিল, যখন অন্যদের ছিল লম্বা লম্বা গোঁফ। সে বিশেষ করে সকাল থেকে আরব মুজাহিদদের কাছ থেকে বিশেষ তদন্ত নিচ্ছিল, যে ক্যামেরা তুলে সাংবাদিকের রূপ ধারণ করেছিল। যখন বাঙ্কারের নিকট থেকে বিস্ফোরণ ও ফায়ারিং এর আওয়ায এল তখন গোঁফওয়ালা সিআইএ-র এজেন্ট তার পিস্তল বের করে সোজা তালিবানের উপর ফায়ার শুরু করে দিল। কিন্তু পূর্ব মুহূর্তেই তার পায়ের কাছে তদন্তের জন্য নিজের পালার অপেক্ষায় বসে থাকা আরব মুজাহিদ দ্রুত লাফ মেরে তার পিস্তলওয়ালা হাত কাবু করে ফেলল। আর অন্যান্য মুজাহিদরা সামনে গিয়ে তাকে চেপে ধরল এবং দেখতে দেখতেই তার 'কাম' তামাম করে দিল। এই ঘটনা দেখে দ্বিতীয় এজেন্ট তার পিস্তলে ফায়ার করতে করতে প্রাণ বাঁচাতে উল্টোপায়ে ভাগতে শুরু করল।

মার্কিন বিমানগুলো কিল্লায় অবরুদ্ধ বন্দীদের উপর ২০০০ (দু'হাজার) পাউন্ড ওজনের বোমা নিক্ষেপ করতে শুরু করে দিল। আগুন লাগার পর ভবনসমূহ ধ্বসে পড়তে লাগল। ময়দানে গর্তের সৃষ্টি হয়ে গেল। বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় এক এক মুজাহিদ বিশ মিটার দূরে গিয়ে পড়ত। তাদের শরীর থেকে খুনের ফোয়ারা বইতে থাকে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আমার কানের পর্দা ফেটে যায় এবং তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। আমেরিকা বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বোমাও ব্যবহার করে। আমার শরীরে এখনো রাসায়নিক বোমার চিহ্ন আছে। আমার সারা শরীর ব্যথা করছে। বিমানের বোমাবর্ষণ এবং দোস্তাম বাহিনীর ট্যাংকের গোলা নিক্ষেপে কিল্লার অভ্যন্তরে বাঁধা তাদের শত শত ঘোড়া মারা যায় এবং আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

এ সময় যে সব আরব মুজাহিদ যুদ্ধ করতে অস্ত্রের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল, তারা আমার নিকট আসে এবং জিজ্ঞাস করে, কিল্লার অস্ত্রভাণ্ডার কোথায়? আমি যেহেতু গাড়ী করে কিল্লায় প্রবেশ করতেই বামদিকের একটা ওয়ার্কশপের দরজায় লাগানো সাইনবোর্ড পড়ে নিয়েছিলাম, যাতে লেখা ছিল "ওয়ার্কশপ হাওয়ান ডিপো" অর্থাৎ মর্টার গানের গুদাম এবং ওর্য়াকশপ। তাই গুলিবৃষ্টিতে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করা আরব মুজাহিদদের নিয়ে সোজা অস্ত্রগুদামে পৌঁছলাম। দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলাম। ওখানে একটি ভাল মর্টার গান মিলে গেল। যখন দুটি বড় মেশিনগান, একটি আর, পি, জি-এর রকেট, একটি কালাশিনকভ, একটি এ্যান্টি এয়ার ক্রাফট গানও মিলে গেল, আমাদের তাৎক্ষনিক প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এখন আমরা অবরুদ্ধ হয়েও মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারছিলাম। আরবরা যেহেতু অতি পরিশ্রমী এবং অস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে থাকে, সেহেতু আমি একজন আরব মুজাহিদকে ট্যাংকবিধ্বংসী রকেট এবং আরেকজনকে এ্যান্টি এয়ার ক্রাফট দিয়ে কিল্লার দরজার নিকট বসিয়ে দিলাম, যে

পথে ট্যাংকসমূহ আসার সম্ভাবনা ছিল। বাদবাকী অস্ত্র অন্যান্য মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে বিভিন্ন অবস্থানে বসিয়ে দেয়া হল। এখন কিল্লা কার্যত আমাদের দখলে। শত্রুর বড় দলটা কিল্লার বাইরে সমবেত হল। তারা কিল্লার চারদিক ঘিরে ফেলল। ট্যাংক এবং সাজোঁয়া যানও আনা হল, যাতে মার্কিন এবং বৃটিশ সাঁজোয়া যানও অন্তর্ভূক্ত ছিল। শত্রুপক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত ট্যাংক এবং গোলার জবাবে আমরা কিল্লার অস্ত্রগুদামে পড়ে থাকা পুরনো গোলা এবং রকেটে আগুন লাগিয়ে ছুঁড়ে মারতাম। তা কিল্লার বাইরে গিয়ে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হত। এই কঠিনতম যুদ্ধের সময় এক আরব মুজাহিদ কিল্লাভ্যন্তরে ঘুরে ঘুরে উচ্চ আওয়াজে পূর্ণ জোশের সাথে বলে যাচ্ছিলেন, والله رائحة المسك والله رائحة المسك (আল্লাহ্‌র কসম মিশকের খোশবু আসছে, আল্লাহ্‌র কসম মিশকের খোশবু আসছে!) মুজাহিদগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে লড়ে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকল। যখন গোলা বর্ষণ কিছুটা কমল, তখন আমরা পানি দিয়ে ইফতার করলাম এবং মাগরিবের নামায পড়লাম। আমাদের দলের সাথীরা জিজ্ঞাস করতে লাগল, ‘এখন কী করা যায়? আমাদের কাছে লড়াই করার জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্র ও রসদ নেই। সাফল্যের কোন পন্থা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। আমি যেহেতু মাযার-ই শরীফের সমস্ত এলাকা সম্বন্ধে অবগত ছিলাম, আমি পরামর্শ দিলাম যে, কিল্লার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত চূড়ায় হামলা করে তা কব্‌জা করা যায়। ঐ চূড়ার নিকটবর্তী বসতি পশতুনদের। রাতের আঁধারে ওখান থেকে বের হওয়া সহজ হবে। এক পর্যায়ে আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম চূড়ায় হামলা করে বসলাম, যেখানে দোস্তামের সৈন্যরা মোর্চা তৈরী করেছিল। তারা কিছুক্ষণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তারপর চূড়া থেকে পিছু হটে পালিয়ে গেল। আমরা চূড়া দখল করে নিলাম। এবার কিল্লার বাইরে থেকে সৈই চূড়ার উপর

গুলী বর্ষণ হতে লাগল। চূড়ায় ট্যাংকের গোলা এসে লাগার আগে আমরা অন্ধকারের সুযোগ গ্রহণ করে কিল্লা থেকে অবতরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম।

চূড়া থেকে পাগড়ী লটকিয়ে এক একজন সাথীকে দেয়ালের বাইরে নামানো হচ্ছে। দু-দু তিন-তিনজন করে ধীরে গা বাঁচিয়ে বসতিতে ঢুকে পড়ল। দুশমনের লোকেরা ডানে-বামের অলি-গলিতে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল কিল্লার দিকে। তারা এদিকেই গুলী চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রায় ত্রিশজন আরব, পাক ও আফগান মুজাহিদ কিল্লা থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়তে সফল হল। আমি বাকী আরব মুজাহিদদেরকেও বের হওয়ার পরামর্শ দিলে তারা اما الفتح واما الشهادة (হয় বিজয় না হয় শাহাদাত) বলে বেরিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানাল। যখন তারা কোন মতেই যেতে সম্মত হল না তখন শেষ পর্যন্ত আমিও কিল্লা থেকে নেমে ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে পা বাড়ালাম। কিল্লার বাইরে সৈন্য আরো সমবেত হচ্ছিল। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে মাযার-ই শরীফ থেকে বের হয়ে আমরা তিনটি দলে বিভক্ত হলাম। দু'দল চারবুরজকের দিকে রওয়ানা হলাম এবং একদল বলখের দিকে। আমরা সারারাত পায়দল চলে সকালবেলা বলখের এক গ্রামে পৌঁছে গেলাম। যখন আমরা ঐ গ্রামবাসীকে বললাম যে, আমরা জঙ্গি কিল্লা থেকে এসেছি, তখন তারা আমাদের অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগল। তারা আগুন জ্বালল, গরম পানি আনল; আমাদের হাত-মুখ ধুইয়ে দিল। বারুদ, ধোঁয়া এবং মাটির কারণে আমাদের অবস্থা ছিল শোচনীয় এবং কয়েক প্রহর থেকে খানা না খাওয়ায় দুর্বলতাও ছিল অনেক। গ্রামবাসীরা আমাদেরকে রুটি দিল। আমরা রোযা রাখলাম। আযানের পর ফজর নামাজ পড়ে ফের রওয়ানা হয়ে গেলাম। কমান্ডার.... এর গ্রামের ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে তাঁর ডেরায় পৌঁছে গেলাম। যখন আমরা

কমান্ডার... এর ডেরায় পৌঁছলাম, তখন ওখানে তালিবানের সাবেক কমান্ডার ইন চীফ মোল্লা দাদ উল্লাহ এবং সামারগানের গভর্ণর মোল্লা আবদুল মান্নান হানাফী এবং মোল্লা আবদুল আলী আগ থেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাদের সাথে মিলিত হয়ে অনেক আনন্দিত হলাম এবং আমরা তিনদিন পর্যন্ত তার ডেরায় কাটালাম। তৃতীয় দিন সংবাদ পেলাম, দোস্তাম মার্কিন সৈন্যদের সাহায্যে কিল্লা-ই জঙ্গী দখল করে ফেলেছে এবং শত শত মুজাহিদকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। আর ক'জনকে জীবিত গ্রেফতার করে নেয়া হয়েছে। মার্কিনীরা বাঙ্কারে পানি এবং পেট্রোল ছেড়ে ওটাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বাঙ্কার আগুন এবং ধোঁয়ায় ভরে যায়। ঠাণ্ডা পানি এবং ধোঁয়ার কারণে আহত মুজাহিদগণ শহীদ হয়ে যান। যাঁরা বেঁচে ছিলেন, তারা সারা রাত হিমশীতল পানিতে দাঁড়িয়ে থাকায় তাদের পা অবশ হয়ে যায়। তারা নড়াচড়া করতে পারছিলেন না। সকালবেলা রেডক্রস কর্মীরা তাদেরকে বাইরে নিয়ে এল। তারপর তাদেরকে গ্রেফতার করা হল। আহতদের সাথে খুবই খারাপ আচরণ করা হল। ভারী পাথর দ্বারা তাদের মাথা চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়া হল। তাদের পেট চিরে দেয়া হল। আমার কাছে এ খবরও এসেছিল যে, দোস্তাম মুজাহিদীনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তৃতীয় দিন কমান্ডার মোল্লা ফযল আখন্দকে কিল্লায়ে জঙ্গীতে নিজের সাথে নিয়ে এসেছিল। যেন তিনি মুজাহিদীনকে অস্ত্র সমর্পণ করতে বলেন এবং যারা জীবিত লুকিয়ে ছিলেন তারা হামলা না করেন। দোস্তাম মোল্লা ফযল আখন্দকে এটা দেখানোর জন্য নিয়ে এল যে, তিনি দেখে নেন যে, তালিবান বিদ্রোহ করেছে। অথচ আমরা জানতাম, ওখানে কী ঘটেছিল! কমান্ডার.... এর অনুপস্থিতিতে তাঁর ডেরায়-আমাদের কাছে তাদের সব খবর পৌঁছতে থাকে। তৃতীয় দিন আমরা রাতেরবেলায় গোপনে রওয়ানা হলাম। আমাদের শঙ্কা ছিল যে, কমান্ডার লোভে পড়ে

আমাদেরকে দোস্তামের হাতে তুলে দিবে। মোল্লা দাদ উল্লাহ অন্য কোন দিকে চলে গেলেন। আমি দু'জন সাথীসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামে আশ্রয় নিলাম। আমি যাদের ঘরে অবস্থান করলাম তাদেরকে দু'টি কালাশিনকভ ও একটি অয়্যার্লেস দিয়ে দিলাম। তারা যারপর নাই আনন্দিত হলেন। তৃতীয় দিন খবর ছড়িয়ে পড়ল। দোস্তাম বাহিনী ট্যাংক সহকারে গ্রাম ঘেরাও করতে শুরু করল। ঘরের মালিক ঘেরাও সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিজের ছেলে আমাদের সাথে রওয়ানা করে দিলেন। তারা আমাদেরকে পিছন দিক থেকে অন্য গ্রামে তাদের আত্মীয়বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ওখানে কিছুক্ষণ বিরতি নিলাম। এরপর পরস্পর পরামর্শ করে আমার দু'জন সাথী ওখানে অবস্থান করল। আমি আবার পূর্বোক্ত বাড়ীতে চলে আসলাম। আমি ওখানে প্রায় তিনমাস অবস্থান করি। একবার ঘরে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় রেডিওতে বল্‌খ থেকে দোস্তামের বক্তব্য প্রচার শুরু হল। যাতে সে সুবারগানের জেলে বন্দীদের সম্বোধন করে বলল যে, তোমরা মোল্লা ফযল এবং মোল্লা দাদ উল্লাহর সাথী এবং তোমরা আমার সাথীদেরকে শহীদ (!) করেছ। কাজেই তোমরা নিরপরাধ নও। তোমাদেরকে কখনো মাফ করা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। রেডিও থেকে আজে-বাজে গান প্রচারিত হতে থাকে। অথচ তালিবান আমলে এসব কিছুই ছিল না।

যোহরের পর একদিন আমি গ্রাম থেকে বের হলাম। তখন লোকেরা আমাকে বলল যে, আপনার আরো একজন মুজাহিদ সাথী আছেন, যিনি ঐ নিকটবর্তী জমিতে কাজ করছেন। আমি যখন ঐ জমিতে গেলাম, তখন ওখানে এক আরব মুজাহিদ ছিলেন। যার কাঁধে ক্ষত ছিল। তিনি আহত অবস্থায় কিল্লা থেকে বের হতে সফল হয়েছিলেন। তিনি উজবেকী পোশাক পরে একজন কিষাণের রূপ ধারণ করেছিলেন। এক হাতে তিনি কোদাল এবং আরেক হাতে

চড়কির লাঠি ধরে ছিলেন। তিনি ছিলেন তায়েফের অধিবাসী। একটা ক্ষেতের পাশে বসে আমাদের আলোচনা হল। পুনরায় তিনি তার গ্রামে এবং আমি আমার গ্রামে চলে আসি। চলে আসার সময় আমি তাকে ১৫০০০ (পনর হাজার) রুপি পকেট খরচ দিলাম। রোযার ঈদের পর দোস্তাম বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সেই আরব মুজাহিদ এবং আমার দু'জন তালিবান সাথীকে গ্রেফতার করল। **আমি আবার বেঁচে গেলাম**। এই গ্রামে আমার নাম ছিল আবদুল **গাফফার**।

এভাবে আমি আর ক'দিন গা বাঁচিয়ে থাকব! তাই অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হল কাবুল যাওয়ার। এটা খুবই খতরনাক সফর ছিল। যাতে কদমে কদমে গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আমাকে আশ্রয়দাতাদের প্রচেষ্টা এবং দুঃসাহসের প্রশংসা করতে হয়। তারা তাদের জনৈকা বোরকা পরিহিতা বৃদ্ধা মহিলা এবং দু'টি বাচ্চা আমার সাথে রওয়ানা করে দেন এবং নিজেরাও পিছে পিছে আসতে থাকেন। আমি মাথায় পাঞ্জেশীরী টুপি পরে সিগারেট মুখে পুরে পোশাক-আশাক বদল করে পথিকের রূপ ধরে মাযার-ই শরীফ বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলাম। ওখান থেকে ট্যাক্সিতে কাবুল রওয়ানা হলাম। চেকপোস্টের নিকট এসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নির্দ্বিধায় বাচ্চাদের কোলে নিয়ে বসে থাকলাম। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের প্রহরীদের থেকে গা বাঁচিয়ে কাবুল পৌঁছলাম এবং রাত হোটেলে কাটালাম। রাতেরবেলায় আশ্রয়দাতাদের নিকট নিজের বিস্তারিত পরিচয় দিলাম এবং নিজের পুরো কাহিনী শুনিয়ে দিলাম। তারা হতবাক হয়ে গেল। আমি তাদেরকে তিন মাস পর্যন্ত সাবধানতাবশত নিজের সম্বন্ধে কোন কিছু বলি নি। তারা আমার কাহিনী শুনে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হল। সকালে উঠে নামায পড়লাম। আশ্রয়দাতাদের সাথে বিদায়ী মুলাকাত করলাম এবং তাদের পুনরায় মাযার-ই শরীফের দিকে

রওয়ানা করে দিলাম। এবার এখান থেকে সামনের দিকে আমি একা সফর করছিলাম। আমি কাবুল থেকে গজনী পৌঁছলাম। বাসস্ট্যান্ডে নামতেই এক ব্যক্তি আমাকে দেখে কোন কথা-বার্তা ছাড়াই আমার হাত ধরে তার গাড়ীতে নিয়ে সামনের দিকের আসনে বসিয়ে দিলেন এবং দ্রুত শহর থেকে বের হয়ে কান্দাহারের দিকে রওয়ানা দিলেন। এ ট্যাক্সিচালক ছিলেন আমার পুরনো বন্ধু। যিনি রণাঙ্গনে আমার সাথী ছিলেন। আজ-কাল হালাল রুজির তালাশে গাড়ী চালাচ্ছেন। রাস্তায় আমার ঐ বন্ধুকে সব কাহিনী শুনালাম। তিনি খুব খুশী হলেন। রাত যাপন করলাম শহরে। সকালে খবর পেলাম, কান্দাহার পর্যন্ত সামনে কোন চেকপোস্ট নেই। এভাবে আমি কান্দাহার শহর নিরাপদে অতিক্রম করে নিজ বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম।

কুন্দুজে আমাদের সাথে কী ধরনের প্রতারণা করা হয়েছে! কিল্লায় কী কিয়ামত চাপিয়ে দেয়া হয়েছে! এবং আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া কয়েদীদের উপর কী অত্যাচার চালানো হয়েছে!....... এসব আমি কখনো ভুলতে পারব না। শহীদানের এক এক ফোঁটা খুনের হিসাব কুদরত অবশ্যই নিবেন, মহান আল্লাহর দরবারে আশা করি। কেননা তিনিই অবস্থার পরিবর্তনকারী।

মার্কিন-অত্যাচারের রক্তাক্ত দাস্তান

এক আইরিশ সাংবাদিকের হৃদয়কাঁপানো তথ্য

বিগত দিনগুলোতে খবর এসেছিল যে, আমেরিকা যুদ্ধ বিষয়ক অপরাধের বিচারের জন্য আদালত কায়েমের বিরোধিতা করেছে।

অথচ, ইতোপূর্বে সে এ ব্যাপারে জোর দিয়ে আসছিল। আমেরিকার এই বিরোধিতার পিছনে তার মনের ভিতরের রহস্য সম্পর্কে আপনারা এই রিপোর্ট থেকে জানতে পারবেন, 'দৈনিক পাকিস্তান' যার তর্জমা প্রকাশ করেছে।

এই রিপোর্টে আমেরিকার যে হিংস্রতা এবং আরব ও পাকিস্তানী মুজাহিদীন ও তালিবানের উপর আপতিত রক্তাক্ত অত্যাচারের যে কাহিনী পেশ করা হয়েছে, এ থেকে বুঝা যায়, আমেরিকার নির্মমতায় মানবতা কেঁপে উঠেছে। সে তার অপরাধের উপর পর্দা ফেলার সর্বতো প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু এক আইরিশ সাংবাদিক প্রামাণিক দলীল সহকারে সে সবের অনুসন্ধান নিতে সফল হয় এবং সে আমেরিকার হৃদয়কাঁপানো বন্য আচরণ সম্পর্কে দুনিয়াকে অবগত করে দেয়। দেখা যাক, কখন কুদরতের হাত নড়ে ওঠে এবং চেঙ্গিসী আচরণের হিসাব নিকাশ হয়ে যায়।

....

১২ই জুন আয়ারল্যান্ডের এক সাংবাদিক জিমি ডোরান জার্মান পার্লামেন্টে ২০ মিনিট স্থায়ী এক ফিল্ম প্রদর্শন করেন। যাতে মাযার-ই শরীফ ও শাবারগানের নিকটে সন্ধান পাওয়া দু'টি গণকবর দেখানো হয়। যাতে প্রায় এক থেকে তিন হাজার তালিবান ও আল কায়েদার জানবায মুজাহিদ চির নিদ্রায় শায়িত। উভয় কবর থেকে মানুষের অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সে সব লাশের উপর মাংসাশী বিহঙ্গগুলোর এবং কুকুরের নখর আঁচড়ের স্পষ্ট আলামত ছিল বিদ্যমান। এসব কবরে কে দাফন হয়েছে? এরা আফগানিস্তানের কোন্ জাতি-গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিল? এদেরকে হত্যা করেছে কে? কেন করেছে? এই ফিল্মে এসব প্রশ্নের জবাব সম্পূর্ণ বিদ্যমান।

পজিশন ফর হিউম্যান রাইটস্ এর ডেপুটি ডাইরেক্টর বিবিসিকে বলেছেন যে, কোন শক্তি এমন আছে যে, এই লাশগুলোর বিস্তারিত

পর্যবেক্ষণের অনুমতি না দিয়ে বা কোন বিশেষ গ্রুপ নিজেকে যুদ্ধাপরাধ থেকে বাঁচাতে চায়? পজিশন ফর হিউম্যান রাইটস্ (পি,এইচ,আর) দাবী করে যে, যুদ্ধাপরাধের এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যকে ঐ সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হোক যতক্ষণ পর্যন্ত না এ মোকদ্দমা মানবতাবিরোধী অপরাধের আন্তর্জাতিক আদালতে পেশ করা হবে। তন্মধ্যে একটি গণকবর শাবারগান শহর থেকে আধা ঘণ্টার ব্যবধানে অবস্থিত। যেটা ১লাখ ৪০ হাজার ৬২৫ চতুর্ভুজ ফুট। অর্থাৎ ৩২ কানাল বা ১৪ এ্যাকটর ক্ষেত্রফল। এবং এটা চতুর্ভুজ আকৃতিবিশিষ্ট। কবরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪৭৫ ফুট। এবং এতে প্রায় এক থেকে তিন হাজার লাশ দাফন হয়েছে। এই এলাকা উজবেক জঙ্গী কমান্ডার আব্দুর রশীদ দোস্তাম, যে নিষ্ঠুরতায় অন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাতিপ্রাপ্ত-এর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পি, এই, আর এর মতে এ লাশগুলো জানুয়ারী বা ডিসেম্বরে এখানে দাফন করা হয়েছিল, ফেব্রুয়ারীর শুরুতে যাদের সন্ধান পাওয়া যায়। সে সময় এ কবরগুলো হতে পঁচে গলে যাওয়ার দরুণ সৃষ্ট দুর্গন্ধ এতই তীব্র ছিল যে, তা সহজেই অনুভব করা যেত। ফেব্রুয়ারীর শেষ নাগাদ রিপোর্ট তৈরী করে ফেলা হয়।

১লা মার্চে হামিদ কারজাইর কাছে ঐ কবরগুলোর সংরক্ষণ, হত্যাকারীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তাদের চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে জানার জন্য দরখাস্ত পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু কারজাই অদ্যাবধি সে চিঠির জবাব দেন নি। যদ্দারা এই ফলাফল বের করা কঠিন নয় যে, কারজাই সরকার এ সমস্যার উপর যবনিকাপাত ঘটাতে চায়। সংস্থাটি এই ভয়ে যে, এ কবরগুলোকে হত্যাকারী গ্রুপ কোথাও আবার গায়েব করে দেয়, তাদের রির্পোট ২মে-তে প্রকাশ করে দেয়। পি, এইচ, আর মার্কিনীদের কাছ থেকে এটা জানার চেষ্টা করছে যে, তারা এই গণহত্যা সম্পর্কে কতটুকু ওয়াকিফহাল। কিন্তু পেন্টাগন রহস্যজনক বিবৃতির মাধ্যমে কাজ নিয়েছে। কারণ তারা

জানে যে, এটা একটি ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক বিস্ফোরণ, যা শুধু আফগানিস্তান নয় বরং মার্কিন গণরায়কেও তাদের বিরুদ্ধে পাল্টে দিতে পারে এবং আফগানিস্তানে মার্কিনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির বহ্নিমান স্ফুলিঙ্গে পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। পি, এইচ, আর তার রিপোর্টে বলেছে যে, এই গণহত্যা ঐ সময়ে করা হয়, যখন আকাশে মার্কিন বোমারু বিমান ও মার্কিন সৈন্যরা তৎপর ছিল। পি, এইচ, আর এর মেম্বার অফ বোর্ড ডক্টর জিনি লিং সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মার্কিনীরা এ ব্যাপারে কতটুকু জানে এটা বোঝা মোটেই মুশকিল নয়।

সানডে মিরর এর এক সাম্প্রতিক সংখ্যায় মার্কিন ইউরোপীয় ও আফগানী যৌথবাহিনীর বন্দী তালিবানের সাথে নির্যাতন ও পাশবিকতার এক হৃদয়বিদারক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, যা মধ্যযুগের চেঙ্গিস ও হালাকু খানকেও ছাড়িয়ে গেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী কুন্দুজে মার্কিন বাহিনীর সামনে প্রাণভিক্ষা দেয়ার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আট হাজার তালিবান ও আল-কায়েদার জানবায হাতিয়ার ফেলে দিয়েছিল। যাদের মধ্যে আরব, পাকিস্তানী, ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঐ সমস্ত মুজাহিদ শামিল ছিলেন যারা তালিবানের সাথে মিলে ভিনদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জিহাদরত ছিলেন। ডোরান তার ফিল্মে ঐ সাক্ষ্যগুলোকে ফিল্মবন্দী করেছিল, যারা বলছেন যে, এই কবরগুলোতে কে চির নিদ্রায় শুয়ে আছে? তাদেরকে কোন্ অপরাধে হত্যা করা হয়েছে? ফিল্মে কিল্লা-ই জঙ্গীতে শহীদ করা হয়েছে এমন তালিবান ও আল কায়েদা মুজাহিদীনকে দেখানো হয় যাদের মাথায় যখন গুলী করা হয় তখন তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল, যাতে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করা যেতে পারে। এই ফিল্ম জনসমক্ষে চলে আসার পর মার্কিনী ও উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সৈন্যদের বর্বরতা ও পাশবিকতার উপর কঠোর সমালোচনা শুরু হয়ে যায়।

ডোরান তার ফিল্মে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাতকার রেকর্ড করেছেন, যারা তিন হাজার তালিবান কয়েদীর গণহত্যা খোদ স্বচক্ষে দেখেছে। বালুকাময় এ ময়দানে যেখানে এই ফিল্ম তৈরী করা হয়, তালিবান মুজাহিদদের মাথার খুলি, তাদের কাপড়, হাড়, তসবীহ, নামাযের টুপি, জুতা, ক্ষত-বিক্ষত মানব শরীরগুলো স্থানে-স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে ছিল। মহাযুদ্ধের সময় নাজিদের যুলুম ও বর্বরতা এবং রুশদের হাতে বন্দীহত্যার তামাম দাস্তানও এই মার্কিন উৎপীড়নের সামনে বিবর্ণ হয়ে যায়।

ইউরোপে এই ফিল্ম মার্কিন পশুত্ব ও কয়েদীদের সাথে ভীতিকর আচরণের এক মস্তবড় দস্তাবেজ হিসাবে সামনে এসেছে। ইউরোপের সব সংবাদপত্রে এই মানবতাদাহক আচরণের ব্যাপারে দীর্ঘ প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ইউরোপের দু'টি বড় টেলিভিশন কোম্পানী ডোরানের সাক্ষাতকারও প্রচার করে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, মার্কিন টিভি চ্যানেল ও ক্যাবল নেটওয়ার্ক এ ঘটনায় খামোশ। এবং আমেরিকার বিখ্যাত পত্রিকা লস এঞ্জেলস টাইমস্, নিউইয়র্ক টাইমস্ ও ওয়াশিংটন পোস্টও চুপ মেরে আছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে কিল্লা-ই জঙ্গীতে পাঁচ থেকে ছয় শত পর্যন্ত মুজাহিদীনের শাহাদাতের পর মার্কিন বাহিনীর অধীনে তিন হাজার মুজাহিদকে শহীদ করা হয়েছে। কুন্দুজ বিপর্যয়স্থলে আট হাজার তালিবান জানবায উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সৈন্যদের সামনে জীবনের নিরাপত্তা পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে হাতিয়ার ফেলে দেয়। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কমান্ডার রশীদ দোস্তামের এক জেনারেল আমীর জান ফিল্মে এটা স্বীকার করে বলেছে যে, মুজাহিদীন (আমীর জান ইসলামী সিপাহীদের শব্দ ব্যবহার করেছে) এই শর্তের উপর হাতিয়ার ফেলে দেয় যে, তাদেরকে জানের নিরাপত্তা দেয়া হবে। তাদের মধ্য থেকে ৪৭০ জন তালিবান কয়েদীকে কিল্লা-ই জঙ্গী মাযার-ই শরীফে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

যখন ৭,৫০০ কয়েদীকে কিল্লা যাইন নামক জেলের দিকে পাঠিয়ে দেয়া হয়, কিল্লা জঙ্গীতে প্রকাশ্য বিদ্রোহের আড়াল নিয়ে মার্কিনীরা প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে। মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যরা উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সাথে মিলে শত শত কয়েদীকে শহীদ করে। তাদের মধ্য থেকে কতক কয়েদীর ঘাড় মটকিয়ে দিয়ে অকুস্থলেই শহীদ করে দেয়া হয়। কিল্লা-ই জঙ্গীতে মার্কিনী হিংস্রতার সময়ে ৮৬ জন মুজাহিদ কিল্লার নীচে বসে মাথা নীচু করে লুকিয়ে থাকার কারণে বেঁচে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে আবূ যর সুলাইমান আল ফারেস, আব্দুল হামীদ এবং জন ওয়াকারও শামিল ছিল। গোপনে ধারণকৃত এক ফিল্মে জন ওয়াকারকে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থায় দেখানো হয়েছে, যেখানে তালিবান কয়েদীদের দীর্ঘ সারি লেগে আছে। এক মার্কিন অফিসার ওয়াকারের কাছ থেকে অনুসন্ধান নিচ্ছে। তদন্তকারী মার্কিন অফিসারের আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। সে বলছে, ব্যাপার হল, এই সিদ্ধান্ত ওয়াকারকে করতে হবে যে, সে জীবিত থাকতে চায় কি না? যদি সে এখানে মরতে না চায় তবেও তাকে এখানেই থাকতে হবে। আমরা ওকে এখানেই ছেড়ে যাচ্ছি, যেখানে তাকে আজীবন কারাভ্যন্তরেই থাকতে হবে। ফিল্ম চলতে থাকে। যাতে বাকী কয়েদীদের সাথে বৈধ রাখা আচরণের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

যে সব তালিবান জানবাযরা আমেরিকানদের সামনে হাতিয়ার ফেলে দিয়েছিল, সেই সাড়ে সাত হাজারের মধ্যে তিন হাজার কয়েদীকে পৃথক করে ফেলা হয়। এবং তাদেরকে শাবারগান নামক জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যা কুন্দুজ থেকে তিন দিনের ব্যবধানে অবস্থিত। অক্সিজেনরোধক প্রতিটি সামুদ্রিক কন্টেইনারে দুই বা তিনশত কয়েদীকে উঠানো হয়। একজন ড্রাইভারের সাক্ষ্য মতে **১৫০ থেকে ১৬০ জন কয়েদী** কন্টেইনারের ভিতরেই সফরের কষ্ট **ও দম বন্ধ** হয়ে যাওয়ার কারণে শহীদ হয়ে যায়। কয়েদীরা

অক্সিজেনশূন্যতার কারণে চিৎকার শুরু করে দিলে কয়েদীদের সাথে চলমান সেনাবাহিনীর এক রক্ষী তার সাক্ষ্য রেকর্ড করাতে গিয়ে বলেছে যে, তাকে মার্কিন কমান্ডার নির্দেশ দিয়েছিল, কয়েদীদের দ্বারা ভর্তি কন্টেইনারের উপর গুলী করে ছিদ্র করে দেয়া হোক। যাতে বাতাসের পথ হয়ে যায়। জনৈক টেক্সী ড্রাইভার তার বর্ণনা রেকর্ড করাতে গিয়ে বলেছে যে, সে কন্টেইনারের একটি দীর্ঘ সারি প্রত্যক্ষ করেছে। ঐ কন্টেইনারগুলো থেকে রক্ত বেয়ে পড়ছিল, এই দৃশ্য দেখে আমার রোম খাড়া হয়ে যায়।

শাবারগান জেলের এক কয়েদী তার বর্ণনা রেকর্ড করাতে গিয়ে বলেছে, তার সামনে মার্কিন সৈন্য একজন কয়েদীর ঘাড় মটকে ভেঙ্গে দেয় আর তড়পানো লাশের উপর ছড়ি মারতে থাকে। নিজের সাক্ষ্য রেকর্ড করাতে গিয়ে সে আরো বলেছে, তার চোখের সামনে মার্কিন সৈন্যরা তালিবান কয়েদীদের মাথা মুণ্ডিয়ে দিত। অতপর তাদের মাথায় গরম পানি ঢালত। অথবা তার সাথে মিশ্রিত বস্তু ঢেলে দিত। যদ্দরুণ ঐ কয়েদীরা তড়পাতে থাকত। এর উপর মার্কিন সৈন্যরা উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ত। একজন সৈন্য তার সাক্ষ্য রেকর্ড করাতে গিয়ে বলেছে, মার্কিন সৈন্যরা তালিবান কয়েদীদের আঙ্গুল ও জিহ্বা কেটে দিত। অতপর তাদের মাথায় গরম পানি ঢালত। মার্কিনীরা এসব কিছু চিত্তাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য করত। মার্কিনীরা জেল থেকে কয়েদীদের বের করত। তাদের দাড়ি মুণ্ডিয়ে দিত। তাদেরকে এহেন উৎপীড়নের নিশানা বানাত যে, তারা বেহুঁশ হয়ে যেত। অথবা ফের মার্কিনীরা মেরে মেরে ক্লান্ত হয়ে যেত। তারপর তাদেরকে পুনরায় জেলের ভিতর বন্দী করা হত। অনেক সময় মার্কিনীরা জেল থেকে কয়েদীদের বের করে সাথে করে নিয়ে যেত। এরকম কয়েদী আর কখনো ফিরে আসত না। আমার

উপস্থিতিতে কতক কয়েদী গায়েব হয়েছে। এক আফগান সৈনিক তার বর্ণনা রেকর্ড করাতে গিয়ে বলেছে, মার্কিনীরা এ কাজ স্যাটেলাইট ক্যামেরা থেকে এড়িয়ে করত। এক মার্কিন কমান্ডার শাবার গান জেলে দাঁড়িয়ে কন্টেইনারের ট্রাক ড্রাইভাদেরকে নির্দেশ দিল, 'ক্যামেরার নজরে আসার পূর্বেই এই কন্টেইনারগুলোকে 'দশতে লায়লা' নিয়ে যাও, আর ওখানে উপস্থিত জীবিত ও মৃত তালিবান কয়েদীদেরকে দাফন করে দাও'। দু'জন সাধারণ শহুরে ট্রাক ড্রাইভার ঘটনার সত্যায়ন করতে গিয়ে বলেছে, তারা তিন হাজার কয়েদীকে সাহারায় নিয়ে যায়, যেখানে তাদেরকে যিন্দাহ দাফন করে দেয়া হয়। একজন ড্রাইভার তার সাক্ষ্য রেকর্ড করাতে গিয়ে বলেছে ,এই গণকবরে নিয়ে যাওয়া কয়েদীদের মধ্যে জীবিত কয়েদীদেরকে ৩০/ ৪০ জন বিশিষ্ট মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতিতে গুলীতে ভুনে ফেলা হয়। এবং তাদেরকে পাঁচ ফুট গভীর ও ১৪ এ্যাক্টর ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কবরে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর বুলডোজারের সাহায্যে মাটি দেয়া হয়। এরপরও কুকুর এবং অন্যান্য মাংসাশী হিংস্র বন্য জন্তুরা মাটি খুঁড়ে মানব অস্তিত্ব বের করে নেয় এবং সেগুলো থেকে গোশ্ত আঁচড়ে আঁচড়ে ভক্ষণ করতে থাকে। ফিল্মের শেষ সিনে মুজাহিদদের শরীরের অবশিষ্টাংশ ও তাদের দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকা কাপড়গুলো দেখানো হয়।

মাযার-ই শরীফ বিমানবন্দরের নিকটে একটি নিতান্ত অ-গভীর গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। জাতিসংঘ প্রতিনিধির মতে, আফগানিস্তানের যত যত অভ্যন্তরীণ অঞ্চল পর্যন্ত জাতিসংঘের উপস্থিতি ঘটবে, আরো অনেক গণকবর পাওয়া যাবে। পি, এইচ, আর এর ডেপুটি ডাইরেক্টর এই গণকবরগুলো ঐ সময় সফর করেন, যখন তা হতে পঁচে গলে যাওয়ার কারণে সৃষ্ট দুর্গন্ধ এতই তীব্র ছিল যে, তা অনেক দূর থেকে অনুভব করা যেত। তিনি বলেন, এটা

দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এমন কোন শক্তি কি বিদ্যমান যারা এ কবরগুলোকে সাধারণভাবে দেখার জন্য অনুমতি দিচ্ছে না, আর না এই লাশগুলোর পোস্ট মর্টেম করতে দেয়া হচ্ছে। যা ব্যতীত এটা নির্ধারণ করা মুশকিল যে, এঁরা কারা ছিলেন, যারা এই গণকবরে দাফন হয়েছেন। পি, এইচ, আর বলেছে, কারজাই ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর মুখে সম্পূর্ণ রহস্যজনকভাবে নীরবতার মোহর লেগে আছে। কারণ তারা জানে, রহস্য উন্মোচিত হলে একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

পি, এইচ, আর এর রিপোর্ট মতে, যখন তারা এই গণকবর পরিদর্শন করেন, তখন ওখানে তাজা মাটির স্তুপ বিদ্যমান ছিল। এবং যে সব ট্রাকে করে এই বদকিসমত কয়েদীদেরকে এখানে আনা হয়েছিল, সেগুলোর টায়ারের চিহ্নও বিদ্যমান ছিল। নান্ডু টাইমস-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে পি, এইচ, আর এর ডেপুটি ডাইরেক্টরের উদ্ধৃতি দিয়ে দাবী করা হয় যে, মার্কিন জোট বাহিনীর একটি ছোট বাহিনী গণকবর এলাকা অবরোধ করে রেখেছিল। যখনই তারা অবরোধ খতম করল এবং তারা ওখান থেকে চলে গেল তখন উক্ত সংস্থা এই গণকবর আবিষ্কার করে। রিপোর্টে বলা হয়, বিভিন্ন গোত্রীয় দলের অফাদার আফগান সৈন্য ও মার্কিন সংস্থার মতে এটা ঐ সময় ছিল যখন মার্কিন বিমান আকাশ থেকে 'কিয়ামত' বর্ষণ করছিল, আর তাদের সৈন্যরা যমীনে সরগরম ছিল। আমেরিকা জানে যে, তারা এই কয়েদীদের সাথে কী আচরণ করেছে! মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ একটি প্রতিবাদমূলক বিবৃতি প্রকাশ করে। যাতে বলা হয় যে, তারা পি, এইচ, আর এর এ দাবী সম্পর্কে অবহিত নয় যে, মার্কিনীরা তালিবান কয়েদীদের গণহত্যা পরিচালনা করেছিল। সামরিক ভাষ্যকার বলেন, আমরা আমাদের রেকর্ড চেক করেছি। এই অভিযোগগুলির উদ্ধৃতিতে আমাদের কাছে কোন রেকর্ড নেই।

কিন্তু কতই চিত্তাকর্ষক কথা যে, যে বিষয়ের জ্ঞান মার্কিন সৈন্যদের নেই, জাতিসংঘ সে সম্পর্কে অবগত হওয়ার কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে!

জাতিসংঘ তার প্রেস রিলিজে বলেছে তার মানবাধিকার বিষয়ক অভিজ্ঞদের টিম উত্তর আফগানিস্তানের শহর মাযার-ই শরীফের পশ্চিমে একটি বিশাল গণকবর সফর করেছে। জাতিসংঘের ভাষ্যকার এনানুইল ডি আলমাইড বুসলোয়া বলেন, এ লাশগুলোকে ভারী মেশিনের সাহায্যে দাফন করা হয়েছে। জাতিসংঘ আরো বলতে অস্বীকৃতি জানান যে, এই ভারী মেশিনারী কারা এখানে এনেছে? আই, পি, সংবাদের সত্যায়ন করতে গিয়ে বলেছে এটাই ঐ গণকবর যেটা পি, এইচ, আর আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু এটা জানা সম্ভব হয় নি যে, এই কবরে কতজন লোক দাফন হয়েছে। তারপরও এটা স্পষ্ট, এই বদকিসমত মানুষগুলোকে অপ্রতিরোধ্য শক্তি দিয়ে মারা যাওয়া প্রাণসংহারী যন্ত্রাদির মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছিল। জাতিসংঘের টিম তিনটি লাশের পোস্ট মর্টেম করে যারা গোত্রীয়ভাবে পাখতুন প্রমাণিত হয়েছে। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০১ইং এর হেমন্তের পর এদেরকে এখানে দাফন বা শহীদ করা হয়। আর এটা হচ্ছে আফগানিস্তানের উপর মার্কিন বিজয়ের সময়। এক আফগান সৈন্য ডোরানকে তার বর্ণনা রেকর্ড করাতে গিয়ে বলেছে, মার্কিনীরা যাচ্ছেতাই করে বেড়াত। কারো মনে তাদের রোখার সাহস ছিল না। সানডে মিরর এর ভাষায়, কয়েদীদের নিয়ে আসা ট্রাক ড্রাইভার বলেছে, অনেক অনেক কয়েদী ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এবং তাদের একটি বৃহদাংশ দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে শহীদ হয়ে যায়। ফিল্মে ছয়টি সাক্ষ্য পেশ করা হয়। তন্মধ্যে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের এক জেনারেল আমীর জানও শামিল ছিল। সকল সাক্ষী এ কথার উপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মত হয় যে, তারা যুদ্ধাপরাধের আন্তর্জাতিক

ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হতে প্রস্তুত। ফিল্মে পি, এইচ, আর এর পক্ষ হতে সন্ধানকৃত গণকবরে দাফন হওয়া সদস্য ও সেসব হত্যাকারীদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ সাক্ষীদের পেশ করা হয়। ফিল্ম এটা প্রমাণ করেছে যে, দাফনকৃত সদস্যরা হচ্ছে তালিবান ও আল-কায়েদার কয়েদী, যাদেরকে কুন্দুজ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদেরকে অক্সিজেনরোধক সামুদ্রিক কন্টেইনারে করে বধ্যভূমি পর্যন্ত আনা হয় এবং মার্কিন সোনবাহিনীর তত্ত্বাবধানে হত্যা করা হয়। ফিল্ম দেখার পর ইউরোপীয় পার্লামেন্টের জার্মান সদস্যগণ বলেছেন, জুলাই এ অনুষ্ঠিতব্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্ট অধিবেশনে এ মামলা উত্থাপন করা হবে। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের অপর কয়েকজন সদস্য রেডক্রসের ইন্টারন্যাশনাল কমিটির কাছে দাবী করেন যে, তারা এই ফিল্মে ধারণকৃত সমস্ত অভিযোগের নিরপেক্ষ নিষ্পত্তি ও প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করুক।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনের খ্যাতিমান একজন উকিল এ্যান্ডর ইউ, এম, সি, এন, টি ফিল্মে প্রদর্শিত ঘটনাবলীর উপর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, এটা মার্কিন ও আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে যুদ্ধাপরাধ। তিনি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী করে বলেন, দুনিয়ার কোন আইনই এসব সাক্ষ্য বিস্মৃত হতে পারে না। নভেম্বর ২০০১ইং-তে নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্টও এই গণকবরবাসীকে তালিবান কয়েদী হিসাবে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। রিপোর্টে বলা হয় যে, কুন্দুজ থেকে আগত তালিবান কয়েদীতে পূর্ণ কন্টেইনারগুলোকে উত্তরাঞ্চলীয় জোট কমান্ডার এবং মার্কিন মিত্র আব্দুর রশীদ দোস্তাম সাহারায় নিয়ে গিয়েছিল। কারণ সে তাদেরকে মার্কিন বোমা বর্ষণের কারণে জেলে নিতে পারছিল না।

অথচ এই বোমাবর্ষণ উত্তরাঞ্চলীয় জোটের গোয়েন্দাগিরিতে

করা হচ্ছিল। প্রতিটি কন্টেইনারে প্রায় দুই থেকে তিন'শ তালিবান কয়েদী ছিল, যখন প্রায় তিন'শ জনকে কিল্লা-ই জঙ্গীতে পাঠানো হয়েছিল।

কোন কোন নিরীক্ষকের ধারণা যে, সেসব কয়েদীদের মধ্যে অধিকাংশ পাকিস্তানী, আরব ও অন্যান্য বিদেশী মুজাহিদীন ছিল। জাতিসংঘের মানবাধিকার টিম কয়েকটি লাশকে গোত্রীয় দিক থেকে পশতুন চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু এ রিপোর্ট বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ, স্থানীয় তালিবান কয়েদীদেরকে কুন্দুজে অনুষ্ঠিত চুক্তি মাফিক ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেয়া হয়েছিল। জাতিসংঘের টিম মার্কিন চাপের মুখে পরিদর্শিত লাশগুলোকে পশতুন হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

১৯ এপ্রিল, ২০০২-এ ওয়াশিংটন পোস্ট-এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী শাবারগান জেলে ১৫ থেকে ৩০ জন কয়েদী পৌঁছে, যখন জেলে বিদ্যমান কয়েদীদের সংখ্যা এপ্রিলে ২৭৭০ জন। যাদের মধ্যে আটজন পাকিস্তানী। যদি কিল্লা-ই জঙ্গীতে পাঠিয়ে দেয়া কয়েদীদেরকে এতে শামিল করা হয় তখন এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬০০ জনে। আব্দুর রশীদ দোস্তাম এর নেতৃত্বে শাবারগান নিয়ে যাওয়া প্রায় ৪৪০০ কয়েদীর ভাগ্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক প্রেস নীরব। মনে হচ্ছে, ১৪ কন্টেইনারে করে নিয়ে যাওয়া এই ৪৪০০ তালিবান কয়েদীই ছিল, আর এই গণকবর সেসব হাজার হাজার শহীদ মুজাহিদদের ছিল যাদের সংখ্যা ছিল ৩/৪০০০ এর কাছাকাছি। ১৪৭ এ্যাক্টর ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট এই কবরে আফগান তালিবান, পাকিস্তানী, আরব ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত ঐ সকল মুজাহিদীন দাফন হয়েছেন, যারা ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখার দুঃসাহস করেছিলেন।

পরদেশে বে-গোর ও বে-কাফন দাফন হওয়া শহীদেরা! তোমাদের অসহায় অবস্থায় মৃত্যুন্মুখ বংশধরদের জন্য নতুন আকাশ আলোকিত করেছ। আমরা কি বিশ্ব বিবেকের কাছে জিজ্ঞাস করার সাহস করতে পারি যে, আন্তর্জাতিক আদালত মানবতাবিরোধী এই যুদ্ধাপরাধের কথা শোনার সাহস করতে পারবে? একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ক্রুসেডের এরা প্রথম যুদ্ধবন্দী ছিল, যাদেরকে আন্তর্জাতিক ঐক্যের 'বীরেরা' অসহায় ও বন্দী অবস্থায় শহীদ করেছে। কোন কোন মুসলমান নিরীক্ষক তো এটাকে ক্রুশ 'বীর'দের হাতে মুসলমানদের গণহত্যা আখ্যা দিয়ে থাকেন। কেননা, একাদশ শতাব্দীর ক্রুশেড যুদ্ধের সময় ক্রুশেড-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও চুক্তির ধ্বজা উড়িয়ে মুসলমানদের উপর গণহত্যা পরিচালনার বড় দুর্নাম ছিল। স্পেনে মুসলমানদের পতন ও পরিসমাপ্তি ক্রুশেডীয় 'বীর'দের গণ হত্যার জীবন্ত উদাহরণ॥

কৃতজ্ঞতা : দৈনিক পাকিস্তান, লাহোর।

লাস্‌সান

একটি বধ্যভূমি একটি উপাখ্যান

কয়েকটি কুকুর, ইঁদুর, বিড়াল আর কয়েকটি শিয়াল
মহানন্দিত মনে এগিয়ে যেতে দেখলাম
নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে এই ঐক্য কোন মহৎ উদ্দেশ্যে?
সংবাদ পেলাম—না।

আজ বনরাজ সিংহের ওপর ওরা নাকি খুব ক্ষেপেছে।
সেদিন থেকে নিসর্গ ভস্ম হতে শুরু করলো
প্রকৃতির উপর যান্ত্রিক পাখিগুলোর
সে কী নিষ্ঠুরতা! সে কী নির্মমতা, সে কী হিংস্রতা!

শান্ত হাওয়া বিষণ্ন
দূষিত হয়ে করুণ রোদন করে।
প্রাচ্য ঘুমায় তেলের মূল্য পেয়ে।
অশনীপ্সু দানবগুলো আদিম হাসিতে ফেটে পড়ে
মানব শরীরগুলো খুবলে খায়।
মাংসাশী শকুন বিহঙ্গগুলো আকাশে ওড়ে
অভিশপ্ত নীল চোখো আর শ্বেত ভল্লুকেরা
যুগপৎ আগ্রাসী থাবা বিস্তার করে
বিশ্বময় বেগবান ধূর্ত শিয়ালগুলো যোগায় ইন্ধন।
বিলয়, বিলয় আর বিলয়।

মহাপবিত্র আসমানী গ্রন্থটির কী অপরাধ?
চরম লাঞ্চনাকরভাবে তাও দূরে নিক্ষিপ্ত হলো।
দেখো মনবাধিকার কর্মীরা! দেখো!

হায় মানবতা! হায় বিশ্ব বিবেক!!

এই ধ্বংসস্তুপ এই ভস্মস্তুপ এই বিধস্ত প্রান্তর
বিশ্বায়নের স্বরুপ তোমরা দেখে নাও
দেখে নাও অমানবতার লজ্জাকর বিজয়
দেখে নাও চেঙ্গীস হালাকুদের বিজয়োল্লাস
শুনে নাও একটি বধ্যভূমির মহা উপাখ্যান।

বিপন্ন মানবতা বিধ্বস্ত জনপদের ওপর
প্রতীচ্য সভ্যতার জয়-ধ্বজা উড়ে আজ।
নীরবে কেঁদে চলে মানবতা নিরন্তর
ওরে অদৃষ্টে বিশ্বাসী মানুষেরা!
মহা সত্যের বিজয়-সূর্য তবে কি উদিবেনা এই অব্দে?
০৫.১০.২০০২
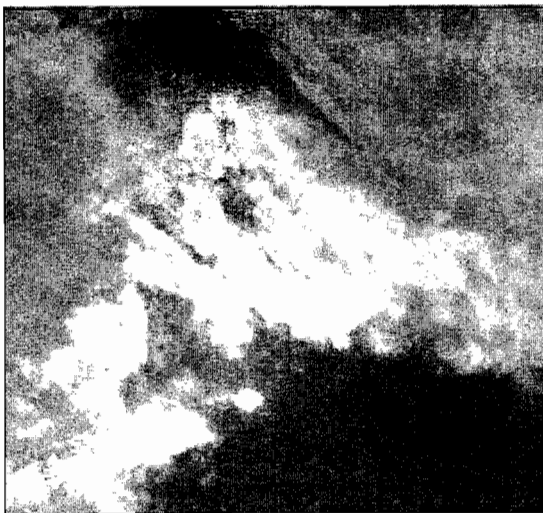
আল মাহমুদ-এর কবিতা

নির্বিবেক পৃথিবীর ওপর এ কার পতাকা

আমাদের দেহের ওপর শত্রুর প্রতিটি অস্ত্রাঘাতই তোমার চেনা। কারণ
প্রতিটি আঘাতই সামনের দিকে। বর্তমান জগতের সবগুলো যুদ্ধক্ষেত্রেই তো
আমি ছিলাম। ছিলাম নাকি? ভুরুর ওপরের এই কাটা চিহ্নটি তোমার এমন
পছন্দ, জানো কি একটি গ্রেনেডের স্প্লিন্টারে
রক্তাক্ত হয়ে যখন লুটিয়ে পড়েছিলাম কারগিলে। মুত্যুর
অন্ধকারে বেহুঁশ হয়েও অবচেতনার এলোমেলো স্বপ্নে তোমার কাছেই
ফিরে আসার সাঁতার। ভাবো সেই আকুলিবিকুলি।
এখন আফগানিস্তান থেকে সঞ্চিত ক্ষতচিহ্নগুলো কি তোমাকে ভয়
ধরিয়ে দিয়েছে? অথচ
আমার পৃষ্ঠদেশে তুমি সারারাত হাতড়েও একটি কাপুরুষতার ক্ষত বের
করতে পারোনি। এবার চুম্বন কর আমার প্রতিটি আঘাতের চিহ্নে, কারণ
পৃথিবীর প্রতিটি রণক্ষেত্রে আমি ভীরুতা, শান্তি ও আত্মসমর্পণের
বিরুদ্ধে লড়ে এসেছি এবং জেহাদের মহিমা প্রচার করেছি। তোমার
উষ্ণ ওষ্ঠের এক সহস্র চুম্বন আমার প্রাপ্য, দাও
ঋণশোধ করে। কে জানে এবার যদি ফিলিস্তিন থেকে আমার আর
ফেরা না হয়? তুমি তো দেখবে না হেবরণের কোনো ধূলিধূসরিত
কান্তারে পড়ে আছে এক শহীদের রক্তে ভেসে যাওয়া
চেহারা, মুখ থুবড়ে। কিন্তু পিঠে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই।
কিংবা আল আকসার আঙিনায় হুমড়ি খেয়ে শিশুর মত পড়ে আছে
এক বিজয়ী বীর যার প্রতিটি ক্ষতস্থান থেকে রক্তের বদলে
বেরিয়ে আসছে যুদ্ধের চিৎকার। আর জেহাদ জেহাদ শব্দে তার
আকুতি ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীতে।

বলো তুমি আর আমি ছাড়া কে আর পৃথিবীতে যুদ্ধ চায়? অধর্মের
বিরুদ্ধে এই হল মানবতার শেষ জেহাদ। আমরা কি আল্লার জমিনে

জানোয়ারের রাজত্ব কায়েমে বাধা দেব না? আমার বাম পাঁজরে
আফগান যুদ্ধের সহস্র বোমার বিধ্বংসী ক্ষতচিহ্ন। তবে কি আমরা
যুদ্ধ ছেড়ে দেব? না, আমাদের নিঃস্তব্ধতা ও মৃত্যুর ভেতর থেকে
জন্ম নিচ্ছে নতুন কবিতা। যুদ্ধের কবিতা। না প্রেম, না শান্তি।

ভাবো, যুদ্ধ ছাড়া ভালো মানুষের আর বাঁচার উপায় রইল না। তোমার
সিজদার জায়গা কোথায়? তোমার কেবলা কোন দিকে?
কবিরা শিল্পীরা কেন এত ভালোবাসার কথা বলে, কেন বলে?
তারা কি মার্কিন বোমার হাত থেকে তাদের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য রক্ষা করতে সক্ষম?
ভালোবাসা, তোমার ওপর নাপাম বোমা।
প্রেমপ্রীতি মনুষ্যত্ব তোমাদের ওপর কার্পেট বম্বিং
মসজিদ মাদ্রাসা সবকিছুর ওপর বোমা। বোমা, নারী শিশু মাতৃউদর।
শিল্প-সাহিত্য রুচি-সভ্যতা-ড্রুম, ড্রুম, ড্রুম।

এরপর একটাই দৃশ্য দেখতে বাকি, নিষ্প্রাণ চাঁদের ওপর
যেমন মার্কিন পতাকা, তেমনি নির্বিবেক পৃথিবীর ওপর
পরাজিত পৃথিবীর ওপর একটি বিশাল
মার্কিন পতাকা।
২০.১১.২০০১

প্রাপ্তিস্থান :

হোমল্যান্ড লাইব্রেরী
স্টেশনারী এন্ড রেকর্ডিং সেন্টার
২৪ নং লাভ লেইন
(মাদানী মসজিদ সংলগ্ন) চট্টগ্রাম।

মীর স্টোর
৪২ নং উপজেলা মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

আজীজিয়া আতরঘর
দক্ষিণ মসজিদ গেইট
কলেজ রোড, বসুরহাট, নোয়াখালী।

মীর স্টোর এন্ড কমিউনিকেশন হাউস
রুমালিয়া ছরা, কক্সবাজার।

মীর পাবলিকেশন্স
১৩ নং আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০

ডিজাইন ও মুদ্রণে-ঃ জাকারীয়া